অজানা দেশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এ কটা ছেলে, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়েস হবে, হাতে একটা রঙিন ঘুড়ি নিয়ে ছুটছে। ঢোলা হাফ-প্যান্ট পরা, গায়ে একটা বড় সাইজের গেঞ্জি, মাথার চুলে চিরুনি ছোঁয়নি। সে ছুটছে সমুদ্রের ধারের বালির ওপর দিয়ে, লোকজনদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে। কখনও রাস্তার মাঝখান দিয়ে, গাড়ি যাচ্ছে এ দিক ও দিক। বয়েসের তুলনায় সে যেন আরও বালক, মুখেচোখে প্রচুর খুশির ছাপ। মুখ দিয়ে সে পোঁ-পোঁ শব্দও করছে।

ঘুড়ির সুতোটা এক একবার ফস্কে যাচ্ছে তার হাত থেকে, সে আবার ধরে আনছে সেটাকে। ছুটতে ছুটতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তার মুখে।

উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে দুটি তরুণী। একজন শাড়ি পরা, অন্যজন স্কার্ট-ব্লাউজ, দু'জনেরই হাতে ছাতা, এখানে যখন তখন বৃষ্টি নামে, এখন অবশ্য ঝকঝকে রোদ। ছেলেটিকে আসতে দেখে দু'জনে থমকে দাঁড়াল।

শাড়ি পরা মেয়েটি বলল, এই ভেলু, শোন্।

ভেলু দু'দিকে মাথা নাড়ল

অন্য মেয়েটি বলল, এই তোর ঘুড়িটা একবার আমায় দে তো।

তাতেও মাথা নাড়ল ভেলু। সে ওদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে দুটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। স্কার্ট পরা তরুণীটি তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরাল।

শাড়ি পরা মেয়েটির নাম মধুজা। সে জিজ্ঞেস করল, আজ কী বার রে সাহানা?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সাহানা বলল, গড নোজ! এখানে এসে কত তারিখ, কী বার, সব ভুলে গেছি।

এক্কা-দোক্কা খেলার মতন সাহানা দু' পা ছড়িয়ে, তারপর সামনের দিকে ছোট্ট লাফ দিয়ে বলল, মনে রেখেই বা কী হবে?

মধুজা একটু ভুরু কুঁচকে রইল।

ভেলু ঘুড়ি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে একটা পাতলা মতন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে গেল ফাঁকা জায়গায়। এটা একটা ছোট্ট মতন বেলাভূমি, বেশ নিরিবিলি।

এখানে রয়েছে একটা অসমাপ্ত নৌকোর খোল। নানা আকারের কাঠ। কিছু যন্ত্রপাতি। একজন প্রৌঢ় মানুষ একটা হাত-করাত দিয়ে মন দিয়ে একটুকরো কাঠ কাটছেন।

এঁর নাম বিশ্বরঞ্জন রায়। এখানে বেশ কিছু দিন আছেন, অনেকেই চেনে, তারা বিশ্ববাবু বা বিশ্বদা বলে ডাকে। প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়েস, দীর্ঘকায় সুগঠিত চেহারা, তবে মুখে বেশ ভাঁজ পড়েছে, যেন অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন। মাথার চুল কাঁচা-পাকা হলেও টাকের চিহ্ন নেই।

ভেলু সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্বকে দেখতে লাগল।

বিশ্বও একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেলুকে দেখলেন, কিছু বললেন না।

ভেলু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী করছ গো বাবু?

বিশ্ব করাত চালাতে চালাতেই বললেন, দেখছিস না, জাহাজ বানাচ্ছি!

ভেলু হিহি করে হেসে উঠল।

হাসছিস কেন রে?

জাহাজ কোথায়? এটা তো নৌকো।

নৌকো? হ্যাঁ, নৌকোই তো। আমি কি একলা একলা জাহাজ বানাতে পারি? নৌকোই বানাব, তবে সেটা দেখতে জাহাজের মতন।

কাজ থামিয়ে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন।

তারপর মাটিতে বিছোনো কয়েকটি বড় বড় কাগজে পুরনো আমলের কাঠের জাহাজের স্কেচ দেখিয়ে বললেন, এই দ্যাখ, এই রকম।

ভেলু বলল, ওসব আমি কী বুঝব? বুঝি লা।

ভেলু একেবারেই ন উচ্চারণ করতে পারে না। তার জীবনে কোনও ন নেই। কেন কে জানে!

বিশ্ব এ ছেলেটার এরকম ল-এর ব্যবহারে বেশ মজা পেল।

ভেলু এবারে চু-উ-উ শব্দ করে ঘুড়িটাকে নিয়ে আবার দৌড়ল বালির ওপর দিয়ে। এবারে ঘুড়িটা পতপত করে ওপরে উঠে গেল অনেকখানি।

ভেলু ইচ্ছে করে সুতোটা ছিঁড়ে দিল। ঘুড়িটা দুলতে দুলতে যেতে লাগল জলের ওপর দিয়ে।

বিশ্ব জিজ্ঞেস করলেন, হাত থেকে বেরিয়ে গেল?

ভেলু বলল, লা, ছেড়ে দিলাম গো। ওটা উড়তে উড়তে স্বগ্যে চলে যাবে। স্বগ্যে আমার বাবা-মা থাকে। আমি তো চিঠি লিখতে পারি লা।

বিশ্ব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

তারপর ভেলুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, চ। খিদে পেয়েছে। আজ কী রান্না হয়েছে রে?

ভেলু বলল, চিংড়ি, এই অ্যাত্ত বড় বড়।

সে হাত দিয়ে দেখাল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমায় দেবে লা।

এই অঞ্চলটার নাম কারবাইন্‌স কোভ। দু' একটা বড় হোটেল, কয়েকটা ছোট হোটেল ও গেস্ট হাউজও আছে।

একটা বড় হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন দু'জন ভদ্রলোক। একজন এদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্ববাবু, কেমন আছেন?

বিশ্ব মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, ভাল। সব ঠিকঠাক?

সেই ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ। আজ ওবেলা তাস খেলতে আসবেন নাকি?

বিশ্ব বললেন, দেখি, এখন বলতে পারছি না।

আরও খানিকটা হেঁটে ভেলুকে নিয়ে পৌঁছলেন একটা গেস্ট হাউজে। সাইনবোর্ডে বড় বড় ইংরিজি অক্ষরে লেখা গীতাঞ্জলি। তার তলায় ব্র্যাকেট দিয়ে একটু ছোট অক্ষরে লেখা অল রুম্‌স এয়ার কন্ডিশন্‌ড।

ভেতরে অফিস ঘরে বসে আছেন ম্যানেজার বরেন শীল, মধ্যবয়েসি, বেশি বেশি রোগা। ইনি সব সময় সুট-টাই পরে থাকেন, সে সুট বেশ ঢলঢলে আর মলিন। কপালে চন্দনের দুটো দাগ।

ভেলুকে দেখেই তিনি ধমকে উঠলেন, অ্যাই, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? তখন থেকে ডাকছি।

ভেলু অম্লান বদনে বলল, এই বাবুর সাথে কাজ করতেছিলাম।

বরেন শীল বললেন, বাবুর সঙ্গে তোর কী কাজ, অ্যা? কী কাজ?

ভেলু বলল বাবু, যে জাহাজ তৈয়ার করে, তাতে ইস্কুরুপ লাগে, পেরেক লাগে, আমি হাতুড়ি দিয়া পেরেক মারি।

বিশ্ব ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি দিলেন।

জাহাজের ব্যাপারটাতে পাত্তা না দিয়ে বরেন শীল আবার বললেন, তোকে যে বলেছিলাম এঁচোড়টা কুটে রাখতে?

ভেলু বলল, আমি এঁচোড় কুটতে জানি লা। হাত আঠা আঠা হইয়ে যায়।

বরেন শীল বললেন, হাত আঠা আঠা হয়ে যায়? গর্দভ। আগে সর্ষের তেল মেখে নিতে বলেছি না?

বিশ্ব সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন ওপরে।

সিঁড়ির ওপর দিক থেকে নেমে আসছে মধুজা ও সাহানা। সরু সিঁড়ি, বিশ্বকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হল।

সাহানা বলল, গুড আফটারনুন, মিস্টার রায়।

বিশ্ব বললেন, সেম টু ইউ।

তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

সাহানা আর মধুজা নেমে এল নীচে।

বকুনি খেয়ে কাজ দেখাবার জন্য ভেলু তখন একটা ডাস্টার দিয়ে কাউন্টারের ওপর ধুলো মুছছে। কাউন্টারের এক পাশে একটা ফ্লাওয়ার ভাসে শুকনো ফুল। এক দিকের দেয়ালে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। দুটি-তিনটি চেয়ার।

সাহানা বলল, এই ভেলু, এখানে ঘুড়ির দোকান কোথায়? কাল আমাকে একটা ঘুড়ি কিনে দিস তো। আমি ঘুড়ি ওড়াব।

ম্যানেজার তার দিকে হাসিমুখে তাকাতেই সে আবার বলল, আমি বাচ্চা বয়েসে নর্থ ক্যালকাটায় থাকতাম। ওখানে খুব ঘুড়ি ওড়ানো হয়। আমি আমার দাদার সঙ্গে—

কাচের দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল, পাজামার ওপর শার্ট পরা, পায়ে রবারের চটি।

সে কোনও কথা না বলে ম্যানেজারের দিকে তাকাল। ম্যানেজারও কোনও কথা না বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করতেই সে চলে গেল ডাইনিং হলের দিকে।

ভেলু বলল, ম্যানেজারবাবু ছুটি দিলে ঘুড়ি কিলে এলে দেব।

ম্যানেজার বললেন, এই তোকে কতবার বলেছি না, শুধু বাবু বলবি। ম্যানেজার! শুনলেই গা জ্বলে যায়।

সাহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন পাজি ছেলে, কিছুতেই ম্যানেজার বলবে না।

সাহানা বলল, 'কিলে এলে' দেবে।

দুই সখী ফুরফুর করে হাসতে লাগল।

মধুজা ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, আজ কলকাতা থেকে জাহাজ আসার কথা নয়? ক'টার সময় ডকে পৌঁছবে বলতে পারেন?

ম্যানেজার বললেন, তা তো আমি ঠিক জানি না। টেলিফোন করে দেখতে পারি।

তিনি দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোন হাতে তুলে নেন।

মধুজা বলল, সায়নটা এমন অদ্ভুত। প্লেনে না এসে জাহাজে আমার জন্য টিকিট কেটেছে। জাহাজে একগাদা সময় লাগে। তিনদিন-চারদিন...

সাহানা বলল, ও দারুণ জল ভালবাসে। নাইনটিন সেভেন্টি এইটে কলকাতায় পরপর সাতদিন বৃষ্টি, একেবারে বন্যা হয়ে গিয়েছিল। সেই দিন সায়নের জন্ম। ও এই গল্পটা প্রায়ই বলে। যেন ওর জন্মাবার দিনটাও...

মধুজা বলল, তা বলে অফিসের কাজে আসছে, কতটা সময় নষ্ট।

সাহানা বলল, তুই ভাবছিস সময় নষ্ট। ও নিশ্চয়ই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে পোয়েট্রি বানাচ্ছে।

মধুজা বলল, পোয়েট্রি? যখন সি-সিকনেস হবে, অনবরত বমি করবে, তখন পোয়েট্রি বেরিয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন বিশ্ব। হাতে একটা ক্যামেরার ব্যাগ।

ম্যানেজার ফোন শেষ করে বললেন, না, ম্যাডাম, কলকাতার জাহাজ আজ আসছে না। কাল। এক্সপেক্টেড টাইম অফ অ্যারাইভাল সকাল দশটা।

মধুজা বলল, কেন? আজ নাইনটিন্থ, আজই তো আসার কথা।

ম্যানেজার বলল, এরকম হয়। সমুদ্রের অবস্থা বুঝে...এক একদিন এমন টারবুলেন্স থাকে...

বিশ্বর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, বলুন।

চামড়ার খাপ থেকে একটা ক্যামেরা বার করে বিশ্ব বললেন, এটা আপনি বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

ম্যানেজার ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, এ তো দেখছি পুরনো ক্যামেরা। এ আর কতই বা দাম হবে।

—দেখুন, যদি কেউ নিতে চায়।

—আজকাল কত নতুন নতুন...আপনি নিজেই যান না, বাজারে গিয়ে দেখুন, ক্লক টাওয়ারের পাশে একটা দোকান আছে।

—না, আপনিই ব্যবস্থা করুন। আমার লজ্জা করে।

—আমি তো স্যার ক্যামেরার কিছুই বুঝি না, কে কী দাম বলবে।

সাহানা বলল, আমি একবার দেখতে পারি?

বিশ্ব বললেন, অফ কোর্স।

সাহানা বলল, এ তো দেখছি লাইকা। এক সময় খুব নাম ছিল। আমার কাকার ক্যামেরার কালেকশান আছে। এই মডেলের ক্যামেরা এখন কেউ ব্যবহার করে না, কিন্তু এর একটা অ্যান্টিক ভ্যালু আছে।

মধুজা বলল, কালেক্টর্স আইটেম। অনেক সময় এসবের ভাল দাম পাওয়া যায়।

সাহানা বলল, আমারই তো নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

বিশ্ব বলল, নিন।

সাহানা হেসে বলল, না, না। দাম-টাম ঠিক না করে, মানে আমি এখন রেডি নই।

বিশ্ব বললেন, আপনাকে দাম দিতে হবে না।

সাহানার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? আমি এমনি এমনি নেব? হোয়াই?

বিশ্ব খানিকটা লজ্জিতভাবে বললেন, স্যরি, আমার ঠিক এইভাবে বলা উচিত হয়নি। আমি বলতে চাইছি, পুরনো ক্যামেরা, আপনার যদি পছন্দ হয়, আপনি নিতে পারেন। দামের ব্যাপারটা ইমমেটেরিয়াল।

মধুজা বলল, এটা আপাতত আপনার কাছেই রেখে দিন। কালকের জাহাজে আমার বন্ধু সায়ন আসবে, সে ক্যামেরা-ট্যামেরা ভাল চেনে। সে এর একটা ভ্যালু ঠিক করে দেবে।

বিশ্ব খানিকটা উদাসীনভাবে বললেন, নাঃ, এটা আমি আর ফেরত নিয়ে যাব না। একবার যখন ঠিক করেছি, এটা আর রাখব না, তখন আর বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিক্রি হোক, না হোক।

সাহানা বলল, ক্যামেরাটা ফেলে দেবেন নাকি? আপনি তো অদ্ভুত লোক!

মধুজা বলল, উনি আর বোঝা বাড়াবেন না। সেই যে গান আছে, 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলই হয়েছে বোঝা।'

বিশ্ব বললেন, আপনি গানটা জানেন? প্রথম লাইনটা কী?

সাহানা বলল, ওসব গান-টান এখন থাক। খিদে পেয়েছে। আমরা লবস্টার রোস্ট খাব। এখানে নাকি ক্র্যাব মিটও ভাল পাওয়া যায়?

মধুজা বলল, আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে পড়েছি, আন্দামানে নাকি এক রকম ক্র্যাব পাওয়া যায়, আমরা যেসব কাঁকড়া দেখি, তার চার গুণ অন্তত সাইজ। সেগুলোর নাম কোকোনাট থিফ্ ক্র্যাব। নারকোল গাছে উঠে দাঁড়া দিয়ে নারকোল ভেঙে ভেতরের শাঁসটা খায়।

সাহানা বলল, ওরে বাবা, দেখলেই তো ভয় লাগবে!

মধুজা বলল, রান্না করে খেতে নাকি সাঙ্ঘাতিক ভাল।

দুই বান্ধবী কথা বলতে বলতে চলে গেল ডাইনিং হলে।

বিশ্ব ক্যামেরাটা তুলে দিলেন ম্যানেজারের হাতে।

॥ ২ ॥

শেষ বিকেলে পশ্চিমের আকাশ স্তরে স্তরে লাল হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে তার ছায়া। ঢেউ-এর সময় মনে হয় লকলক করছে লম্বা লম্বা সাপ।

রস আয়ল্যান্ড থেকে শেষ ফেরি আসার পরেও বন্দর এলাকাটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যায়। এই সময় টুরিস্টরা কেউ ঘরে বসে থাকে না। সমুদ্রের ধারে যে-যেখানে জায়গা পায় বসে পড়ে। কিছু কিছু যাত্রী লঞ্চে চেপে বেড়াতে যায়, সেই সব লঞ্চও ফিরে আসে সন্ধের আগেই।

একটা গাছের তলায় গোল হয়ে বসেছে সাহানা, মধুজা ও আরও কয়েকজন।

গান গাইছে মধুজা : 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে...'।

গানের লয়টা বেশি ধীর, মাঝপথে মধুজাকে থামিয়ে দিয়ে অধৈর্যভাবে সাহানা বলে উঠল, এত স্লো কেন রে? রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেই কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাইতে হবে নাকি?

মাটিতে চাপড় দিয়ে সে খুব দ্রুত লয়ে গাইতে লাগল, খেলা যখন/ ছিল তোমার/ সনে/ তখন/ কে তুমি/ তা কে জানতো।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এটা আবার বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

সাহানা বলল, খেলা তো! তাড়াতাড়ি হবে না?

সেই শ্রোতাটি বলল, এরকম হলে কেমন হয়?

সে আবার মধ্য লয়ে গাইতে শুরু করল সেই একই গান।

কিন্তু সে তিন পঙ্‌ক্তির বেশি গাইতে পারল না, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এসে গেল। এখানে এ রকমই বিনা নোটিসে বৃষ্টি নামে।

থেমে গেল গান। ফটাফট করে খুলে গেল অনেকগুলো ছাতা। বৃষ্টির তোড় বেশি হওয়ায় আর বসে থাকা গেল না। সবাই ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

একটু দূরে একটা বেঞ্চে বসে আছেন বিশ্ব। তিনি উঠলেন না। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে রইলেন।

সাহানা খানিকটা গিয়েও ফিরে এল। খানিকটা ধমকের সুরে বলল, আপনি এখানে শুধু শুধু ভিজছেন? অসুখ করবে না?

বিশ্ব দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

—চলুন, চলুন!

—আমি আর একটু বসব।

সাহানা আবার ফিরে গেল।

বিশ্বকে বেশিক্ষণ ওইভাবে বসে থাকতে হল না। পুরোপুরি গেরুয়া পরা একজন সন্ন্যাসী ছাতা মাথায় দিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিশ্বকে দেখে সেই বেঞ্চে এসে বসলেন। ছাতাটা ভাগ করে নিলেন দু'জনের মাথায়।

বিশ্ব তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি বললেন, জানি, আপনার সব সময় কথা বলার মুড থাকে না। সে রকম হলে কিছু বলতে হবে না।

বিশ্ব মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এক মিনিট চুপ থাকার পর সন্ন্যাসী বললেন, আমরা কথায় বলি, অতল সমুদ্র। অথচ জানি, সব সমুদ্রেরই তল আছে। কোনও সমুদ্রই সাড়ে ছ' মাইলের বেশি গভীর নয়।

বিশ্ব যেন এ কথা শুনতেই পেলেন না।

সন্ন্যাসী আবার বললেন, আকাশে কত তারা জ্বলজ্বল করছে। অথচ এর মধ্যে বেশ কয়েকটা তারা এখন বেঁচে নেই, বহুকাল আগে মরে ভূত হয়ে গেছে, তবু তাদের আলো এসে পৌঁছোচ্ছে বলে আমরা জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি। তার মানে, চোখে আমরা যা দেখি, তা সব সত্যি নয়।

এবারে মুখ ফিরিয়ে বিশ্ব ঝাঁঝালো গলায় বললেন, আপনি আমাকে কী বোঝাতে চাইছেন, বলুন তো!

সন্ন্যাসী নিরীহ ভাবে বললেন, কিচ্ছু না তো, নিজের মনে কথা বলা আমার স্বভাব।

বিশ্ব আবার ধমকের সুরে বললেন, দেখুন মশাই, আপনাদের ওই ভগবান কিংবা কালী-টালিতে আমার একটুও বিশ্বাস নেই। আমাকে ও ব্যাপারে ভজাবার চেষ্টা করে আপনাদের কোনও লাভ হবে না।

সন্ন্যাসী এক গাল হেসে বললেন, কী মুশকিল! আমি কি ভগবানের ইজারা নিয়েছি নাকি! যে লোক ধরে ধরে এনে তাঁর পায়ের কাছে ফেলব? আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন?

বিশ্ব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কাছে কী চান?

সন্ন্যাসী বললেন, কিচ্ছু না! এমনিই আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। আপনি যদি বিরক্ত হন, আমি উঠে যাব?

—না, বসুন। আপনার নামটা ঠিক কী যেন? আপনাদের এখন এত আনন্দ হয়ে গেছে যে সহজ নাম আর পাওয়া যায় না। সব বড্ড খটোমটো!

—আমার নাম স্বতোৎসারানন্দ। আপনি শুধু...

—স্বতোৎসারানন্দ...ভেরি হার্ড টু রিমেমবার। যাই হোক, আপনার নিশ্চয়ই আগে একটা অন্য নাম ছিল?

—তা ছিল।

—সে নাম এখন কারুকে বলবেন না। আপনার বাবা মা, সেই জীবনের কথা বলা নিষেধ, তাই না?

—নিষেধ, মানে, সে জীবন তো ত্যাগ করে এসেছি। তাই আর মনে করতে চাই না সে সব কথা...

—আর একজন সাধারণ মানুষ, যদি এক সময় নিজের নামটা বদলে অন্য নাম নিতে চায়, আগের জীবনের কথা কারুকে না জানায়, তা হলে সমাজ তাকে কী বলবে, জানেন? ক্রিমিনাল, ক্রিমিনাল! সবাই ভাববে, সে কোনও চুরি-ডাকাতি কিংবা সামাজিক অপরাধ করে এখন গা-ঢাকা দিতে চাইছে। কেন, কোনও সাধারণ, নির্দোষ মানুষ, এই এক জন্মেই কি তার দু' রকম জীবন কাটাবার ইচ্ছে হতে পারে না?

কোনও উত্তর না দিয়ে স্বামীজি স্মিত মুখে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিশ্ব আবার বললেন, গায়ে গেরুয়া চাপালে অনেক সুবিধে। আপনাদের তো মশাই সাত-খুন মাপ। ট্রেনে-ট্রামে-বাসে বোধহয় টিকিট লাগে না। প্লেনেও কি বিনা পয়সায়?

সন্ন্যাসী বললেন, টিকিট লাগে কি লাগে না, এর উত্তর আমি দেব না। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, অত সামান্য সুযোগ-সুবিধে পাবার জন্য আমরা গায়ে গেরুয়া চড়াই না।

বৃষ্টি থেমে গেছে এর মধ্যেই।

সন্ন্যাসী উঠে পড়তেই বিশ্ব বললেন, দাঁড়ান, আর একটা প্রশ্ন আছে। আপনি হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে আমার মাথায় ছাতা ধরলেন কেন? আমি লোকের কাছ থেকে অযাচিত উপকার নিতে অভ্যস্ত নই।

সন্ন্যাসী বললেন, এর মধ্যে আবার উপকারের কী আছে? এমনিই দেখলাম, আপনি বসে আছেন, তাই...। আপনার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে। প্রকৃত নাস্তিকেরও বিশ্বাসের একটা জোর আছে। তাও শ্রদ্ধা করা উচিত।

সন্ন্যাসী চলে যাবার পরেও একটুক্ষণ বসে রইলেন বিশ্ব।

গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউজটি খুব উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু এখন টুরিস্টদের এত ভিড় যে সবগুলো হোটেল লজই ভর্তি।

রাত্তির বেলা ডাইনিং হলে ভিড় দেখেই বোঝা যায় যে গীতাঞ্জলিতেও কোনও ঘর খালি নেই।

নানান জনের কথাবার্তায় গমগম করছে ডাইনিং হল। সাহানা আর মধুজা বসে আছে এক টেবিলে, দুটি চেয়ার খালি। তিনটি যুবকের একটি দল এসে জিজ্ঞেস করল, আমরা এখানে বসতে পারি?

সাহানা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কাছাকাছি আর কোনও টেবিলে একটাও চেয়ার খালি নেই। অথচ ওরা তিনজন। বেয়ারাকে ডাকাডাকি করে আর একটি চেয়ার আনাবার আগে, দু'জন বসে পড়ল, দাঁড়িয়ে রইল একজন।

মধুজা আর সাহানা ওদের সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী নয়। কারণ, এদের চেহারায় ও কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাকে বলা যেতে পারে Culture হীনতা। এরা হয়তো ভালই চাকরি করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত হতে চলেছে, কিন্তু উন্নতির সে প্রক্রিয়া ছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ে কোনও রকম আগ্রহী নয়। শিল্প-সাহিত্যের মতন ব্যাপার-স্যাপার ওদের জীবন-পরিধির বাইরে।

হয়তো এরকম ধারণা করাটাই ভুল।

ওদের একজন বললেন, নমস্কার! আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?

সাহানা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

লোকটি বলল, আপনারা তাহলে কোথা থেকে...

সাহানা তার বান্ধবীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সি ইজ ফ্রম নরওয়ে। অ্যান্ড আই অ্যাম ফ্রম ইন্দোনেশিয়া।

লোকটি বিস্মিত ভাবে মধুজার দিকে তাকিয়ে বলল, নরওয়ে?

অন্য লোকটি বলল, ইউ আর বেঙ্গলিজ, নো? সন্ধেবেলা শুনলাম, আপনারা বাংলা গান গাইছেন।

সাহানা বলল, আওয়ার অ্যানসেস্টর্স ওয়্যার ভেরি মাচ্ বেঙ্গলিজ। নাও, উই ডোন্ট নো

মধুজার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ফিনিশড্? লেটস গো।

মধুজা বলল, হাউ অ্যাবাউট সাম সুইট ডিশ্।

একটু দূরে ভেলু অন্য অতিথিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করছে। মধুজা তার দিকে হাত তুলে ডাকল, ভেলু, ভেলু, কাম হিয়ার!

একেবারে শেষের একটা টেবিলে একা বসে খাচ্ছেন বিশ্ব। সে টেবিলে আর দ্বিতীয় চেয়ার নেই। খেতে খেতে তিনি একটা বই পড়ছেন। তিনি অন্য দিকে তাকাচ্ছেন না। কেউ তাঁর ধারেকাছেও যাচ্ছে না।

ভেলু কাছে আসতেই মধুজা জিজ্ঞেস করল, সুইট ডিশ?

ভেলু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, লাই।

অন্য একজন বলল, লাই কী রে? এই যে মেনুতে লেখা আছে ফ্রুট স্যালাড?

ভেলু বলল, জাহাজ আসে লাই। বাজারেও ফল টল কিছু লাই।

মধুজা বলল, কিছু লাই, না ইউ আর টেলিং লাইজ?

অত্যুৎসাহী লোকটি বলল, আপনারা বসুন, প্লিজ সিট, আমি গিয়ে ম্যানেজারকে বলছি।

সাহানা বলল, প্লিজ ডোন্ট বদার। থ্যাঙ্ক ইউ, গুড নাইট।

দুই নারী টেবিল ছেড়ে গেল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

নিজেদের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে এসেই হাসিতে ফেটে পড়ল দু'জনে।

মধুজা বলল, তুই এমন করলি, এবার থেকে সব সময় ওদের সামনে ইংরিজি বলতে হবে।

সাহানা বলল, গায়ে পড়ে আলাপ করা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। কাল থেকে দেখছি, ওরা আমাদের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করছে।

মধুজা বলল, ওরা লক্ষ করেছে, আমাদের সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ নেই।

সাহানা বলল, এই ধরনের লোকেরা কোথাও বেড়াতে এসে মনে করে একটা অ্যাফেয়ার করতে পারলে বেশ হয়। তবে, এই সব টিপিক্যাল বাঙালিরা বাঙালি মেয়ে খোঁজে। ইংরিজিতে কথা বলতে হলে আর উৎসাহ থাকে না।

মধুজা বলল, ফরগেট দেম। নট ওয়ার্থ ডিসকাসিং। এখানে খাওয়ার পরই শুয়ে পড়তে হয়, এটা আমার বিচ্ছিরি লাগে। আর কিছু করার নেই।

ওপরের জামাটা খুলে ফেলতে ফেলতে সাহানা বলল, আর একবার বেরুতে চাস? এখানে তো কোনও ভয় টয় নেই, সবাই বলছে।

মধুজা বলল, হ্যাঁ, চল না। মাথার ওপর অনেকখানি আকাশ, সামনে সমুদ্র, এসব ছেড়ে শুধু শুধু ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয়?

একটা সিগারেট ধরিয়ে সাহানা জানলার ধারে গিয়ে বলল, আবার বৃষ্টি পড়ছে। একটু পরে না হয়...

মধুজা বলল, দে তো তোর সিগারেটের একটা টান!

সে হাত বাড়াল, সাহানা তার হাতে সিগারেট না দিয়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। সিগারেটটা গুঁজে দিল তার ঠোঁটে।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে বিশ্ব এসে দাঁড়ালেন বাইরে যাবার দরজার কাছে।

ম্যানেজার একটা ক্যালকুলেটার নিয়ে কাজ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আবার বেরুবেন নাকি? বৃষ্টি পড়ছে।

বিশ্ব কোনও উত্তর না দিয়ে হাতের বইখানা কাউন্টারের ওপর রেখে বাইরের দরজা খুললেন।

ম্যানেজার আবার বললেন, চাবিটা নিয়ে যাবেন নাকি? যদি বেশ রাত হয়?

বিশ্ব ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিলেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন সেই অসমাপ্ত নৌকোটার কাছে। আধো অন্ধকারে হাত বুলোতে লাগলেন নৌকোটার গায়ে। একটা ছোট্ট অংশ খুলে নিয়ে লাগালেন আবার।

একটু পরে তিনি চলে এলেন জলের ধারে।

এর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেছে আবার। মেঘ সরে যাচ্ছে, আকাশে ফুটছে জ্যোৎস্না।

ঝকঝক করছে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাদা অংশ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্ব। দীর্ঘকায় মানুষটিকে এখন মনে হচ্ছে একটা কালো পাথরের মূর্তির মতন। যেন ওখানেই প্রোথিত, আর নড়বেন না।

একসময় দৌড়তে দৌড়তে ভেলু এসে পড়ল সেখানে।

পেছন থেকে সে ডাকল, ও বাবু! ও গো বাবু।

কয়েক বার ডাকেও বিশ্ব সাড়া দিলেন না।

ভেলু এবার তার হাত ধরে টেনে বলল, ও বাবু, হোটেলে চলো। ঘুমবে না?

বিশ্ব এবার নরম গলায় বললেন, তুই আবার কেন এলি!

ভেলু বলল, কতক্ষণ খাড়ায়ে থাকবে, সারা রাইত?

বিশ্ব বলল, খারায়ে....মানে দাঁড়িয়ে। না রে, কেউ কি সারা রাত

দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? ঘুম এলেই চলে যেতাম।

ভেলু বলল, এত বৃষ্টি ভেজলে তোমার অসুখ করবে যে।

বিশ্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ, আমার অসুখ-টসুখ করে না।

ভেলুর কাঁধে হাত দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন ফেরার পথে।

এর মধ্যে সাহানা আর মধুজা বেরিয়ে এসেছে।

কাছাকাছি আসবার পর সাহানা বলল, গুড ইভনিং মিস্টার রায়।

বিশ্ব বললেন, গুড ইভনিং।

সাহানা আবার প্রশ্ন করল, ইজ ইট সেফ, ইফ উই সিট ওভার দেয়ার ফর আ হোয়াইল?

বিশ্ব শুকনো ভাবে বললেন, আই থিঙ্ক সো। সেফ।

তিনি থামলেন না, এগিয়ে গেলেন।

সাহানা আর মধুজাও কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর থামল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এ মানুষটা আবার অন্যরকম। মেয়ে বলে আমাদের পাত্তাই দেয় না।

মধুজা বলল, একটুও রসকষ নেই। কিংবা কোথাও ঘা খেয়েছে বোধহয়!

॥ ৩ ॥

সকাল ন'টা পঁয়তাল্লিশে বন্দরে এসে ভিড়ল এম ভি হর্ষবর্ধন জাহাজ। আজ এক রৌদ্র ঝলমল দিন। কয়েকটা সিগাল ওড়াউড়ি করতে করতে কর্কশ স্বরে ডাকছে।

জাহাজের ডেকে আরও অনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সায়ন। ত্রিশ-একত্রিশ বছর বয়েস। এই বয়েসেই সে ভাল কাজকর্ম করে। মুখে সেই সার্থকতার চিহ্ন। এই সব মানুষদের সব সময় একটা সপ্রতিভ ভাব থাকে, কিন্তু সায়ন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়। তখন তার চোখ দুটি বড় মায়াময় মনে হয়।

গেটের বাইরে বেশ কিছু লোক অপেক্ষা করছে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কিছু কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীও আসে। কলকাতার জাহাজে নানা রকম অর্ডারি মালপত্রও আসে, বিশেষত সব্জি ও তরকারি, আর কিছু কিছু শৌখিন জিনিস।

এখানেই দাঁড়িয়ে থাকে মধুজা আর সাহানা।

অন্যান্য যাত্রীদের তুলনায় বেশ আগেই চলে এল সায়ন। চোখে সান-গ্লাস, পুরোদস্তুর সুট পরা, হাতে একটা মাঝারি সাইজের সুদৃশ্য ব্যাগ।

দুই বান্ধবীকে দেখে সে সহাস্যে তাদের মৃদু আলিঙ্গন করল, গালে গাল ঠেকাল। তারপর বলল, তোরা সব ঠিকঠাক আছিস তো?

সাহানা বলল, মোটেই না। তোর বিরহে শুকিয়ে গেছি।

সায়ন মধুজাকে জিজ্ঞেস করল, অমিত কোথায়?

মধুজা বলল, দ্যাখো না, সে এখনও পৌঁছয়নি। খালি অফিসের কাজ আর কাজ। কালকের ফ্লাইটে পৌঁছতে পারে।

অন্যরা বেরিয়ে যাচ্ছে, সায়ন তবু দাঁড়িয়ে আছে।

সাহানা বলল, চল। তোর জন্য গাড়ি আসবে?

সায়ন বলল, আসবার তো কথা।

তারপর সে মুচকি হেসে বলল, তোদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

সে পেছন ফিরে তাকাল।

অন্য যাত্রীদের পাশে পাশে আসছে শাড়ি-পরা একটি ছাব্বিশ সাতাশ বছরের মেয়ে, পিঠে লম্বা চুল, কপালে বেশ বড় একটা টিপ। একজন পোর্টারের হাতে মালপত্র চাপিয়ে সে হেঁটে আসছে ধীর পায়ে। মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব।

মধুজা আর সাহানা দু'জনেই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, রিনি!

ওরা দু'জন দৌড়ে গিয়ে রিনিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।

সায়ন বলল, দ্যাখ না সাহানা ও জোর করে চলে এলো আমার সঙ্গে। সাহস আছে বলতে হবে।

রিনি বলল, জোর করে এসেছি? আমার টিকিটটা কে কাটল।

মধুজা জিজ্ঞেস করল, তোর বাবা পারমিশান দিলেন?

রিনি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

—তা হলে?

—মিথ্যে কথা বলে এসেছি। তোদের নাম করে।

সায়ন বলল, ওর দাদাটা এসেছিল।

রিনি আপত্তি জানিয়ে বলল, দাদাটা কী? ওরকম ভাবে কেউ বলে?

সায়ন বলল, না, দাদা। দাদা। পূজনীয় দাদা। তিনি এসেছিলেন খিদিরপুরে তাঁর বোনকে জাহাজে তুলে দিতে। আমাকে যাতে দেখতে না পায়, তাই আমি আগেভাগে পৌঁছে লুকিয়েছিলাম সিঁড়ির নীচে।

—মোটেই সিঁড়ির নীচে ছিলে না। ক্যাপটেনের পাশে গিয়ে বসেছিলে!

সবাই মিলে গাড়িতে ওঠার পর রিনি জিজ্ঞেস করল, এখানকার ওয়েদার কেমন রে, সাহানা?

সাহানা বলল, গ্লোরিয়াস ওয়েদার। শুধু তুই এসে পড়ে আমার আকাশটা মেঘলা করে দিলি। ভেবেছিলাম, এই সুযোগে সায়নের সঙ্গে একটু আধটু প্রেম করে নেব।

রিনি বলল, আহা-হা! তোকে অনেক চান্স দিয়েছি। তোর দ্বারা প্রেম হবে না।

মধুজা জিজ্ঞেস করল, তিন-চারদিন ধরে জাহাজে এলি, তোদের বোর লাগেনি?

রিনি বলল, একটুও না। আমি তো প্রায় সর্বক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আকাশ আর সমুদ্রের কত রকম রূপ...এই জানিস, ফ্লাইং ফিস দেখেছি। একঝাঁক ডানাওয়ালা মাছ। হঠাৎ জল থেকে লাফিয়ে উঠল, তারপর ফরফর করে খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। প্লেনে এলে এ দৃশ্য দেখা যায়?

—আর কী দেখলি?

—ডলফিন তো প্রায়ই দেখা যায়। একবার অনেকগুলো হাঙর একসঙ্গে।

—তিমি দেখিসনি?

সায়ন বলল, বে অফ বেঙ্গলে সচরাচর তিমি আসে না। খুব রেয়ার।

সাহানা জিজ্ঞেস করল, তোদের সি-সিকনেস হয়নি?

সায়ন বলল, রিনির হয়েছে। এক সময় জাহাজ খুব রোল করছিল, এইট্টি পারসেন্ট প্যাসেঞ্জারই সি সিকনেসে ভুগেছে। আমার হয়নি, কেন জানিস? আমি একটা ভ্রমণ কাহিনিতে পড়েছিলাম, সকাল থেকে একটু একটু ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিলে সি সিকনেস হয় না। স্টো হুবহু মিলে গেছে। রিনি তো বমি করেছে তিনবার।

সাহানা জিজ্ঞেস করল, রিনি, তুইও ব্র্যান্ডি খেলি না কেন?

রিনি বলল, ধুৎ, ব্র্যান্ডি খেলে আমার এমনিতেই বমি আসে।

মধুজা বলল, জাহাজে যে আর টুয়েন্টি পারসেন্ট লোকের বমি হয়নি, তারাও কি সবাই ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়েছে!

সায়ন বলল, তাদের কথা আমি জানি না।

সায়ন বসেছে সামনে ড্রাইভারের পাশে, পেছনের সিটে তিন যুবতী। ড্রাইভার তামিল, সম্ভবত বাংলা বোঝে না।

সায়ন পেছন ফিরে নিচু গলায় বলল, শোন, একটা সিরিয়াস কথা আছে। আমার জন্য তো আমার কোম্পানি হোটেল বুক করেছে, আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। রিনি হুট করে এসে পড়েছে, রিনিকে আমার হোটেলে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না।

—কেন?

—এই সময় আন্দামানে হুদো হুদো বাঙালি আসে, তাদের মধ্যে দু'চারজন চেনাশুনো থাকতেই পারে। তারা যদি দেখে রিনিকে আমার সঙ্গে, তাহলে... বাঙালিদের স্বভাব তো জানিসই, যতক্ষণ না সে কথা আমাদের বাড়িতে জানাতে পারবে, ততক্ষণ পেটের ভাত হজম হবে না।

—বাড়িতে জেনে ফেললে কী হবে?

রিনি বলল, দাদা প্রথমে একটু রাগ করলেও দাদাকে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু বাবা... বাবা খুব কনজারভেটিভ।

সায়ন বলল, তোমার বাবা একজন হিটলার!

রিনি ফোঁস করে উঠল, এই, আমার বাবা সম্পর্কে ওরকম কথা বলবে না! আমার বাবা ইজ আ গ্রেট ম্যান। হিস্ট্রিতে বিরাট স্কলার। শুধু ভ্যালুজগুলো এখনও পুরোনো।

সায়ন বলল, পুরোনো মানে? একশো—দুশো বছর আগেকার।

—অ্যাই!

মধুজা জিজ্ঞেস করল, আর তোর মা?
—মা সব সময় আমাকে সাপোর্ট করে। মা একটু একটু আন্দাজও করেছে।
—তোর বাবা তোকে একা একা ছাড়তে রাজি হলেন কী করে?
—দু'দিন ধরে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদলুম। তোদের দু'জনের কথা বলে। তারপর মা আমার হয়ে বাবাকে বলতে গেলে তখন আমি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচের বদলে হু হু করে কেঁদে বললুম, থাক, আমি যেতে চাই না। যেতে চাই না! ব্যাস, তাতেই কাজ হয়ে গেল।
সায়ন বলল, মোট কথা, মধুজা, তোমরা যে লজে আছ, সেখানেই রিনির থাকা ভাল। সেখানে জায়গা হবে তো?
—হতে পারে। গিয়ে খোঁজ করে দেখা যাক।
—আগে তাহলে সেখানেই।
গাড়িটা এসে থামল গীতাঞ্জলি লজের সামনে।
বাইরের দরজার পাশে একটা বেঞ্চ পাতা। কয়েকজন লোক সেখানে বসে কাগজ পড়ছে। বিশ্ব দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজন মিস্ত্রি শ্রেণির লোকের সঙ্গে।
সাহানা গাড়ি থেকে দৌড়ে ঢুকে গেল ভেতরে।
টাই পরা ম্যানেজার একটা গণেশ মূর্তির সামনে ধূপদানিতে ধোঁয়া দিচ্ছে আর বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র পড়ছে।
সাহানা কাউন্টারের সামনে এসে বলল, ম্যানেজারবাবু, আপনার এখানে একটা ঘর খালি আছে? আমার এক বান্ধবী এসেছে।
ম্যানেজার তখনই উত্তর না দিয়ে মন্ত্র পড়া শেষ করলেন।
তারপর দু'দিকে মাথা নাড়লেন।
সাহানা বলল, নেই?
—সবই তো অকুপায়েড। তবে...
—তবে কী? বেশি রেট হলেও ক্ষতি নেই।
—না, না, রেটের জন্য নয়। এই মুহূর্তে খালি নেই। তবে একটা কাপ্‌ল বারোটার সময় চেক আউট করবে। ততক্ষণ যদি অপেক্ষা করেন—
—নো প্রবলেম। ততক্ষণ মালপত্র আমাদের ঘরে রাখবে। ঘরটা এক্ষুনি বুক করুন।
—ঘরটা কিন্তু একতলায়।
—তাতেও ক্ষতি নেই। খাতায় এন্ট্রি করুন। রিনি সেনগুপ্ত। আমি ডেকে আনছি।
হঠাৎ সাহানার চোখ পড়ল, ম্যানেজারের পেছনের একটা তাকে রাখা আছে বিশ্বর সেই ক্যামেরাটা।
—ওটা এখনও বিক্রি হয়নি?
—না, কেউ তো নিতে চায়নি।
—ওটা একটু নিতে পারি? আমার এক বন্ধুকে দেখাব।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিন না।
সায়নরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।
সাহানা কাছে এসে বলল, ডান্। ঘর বুক করা হয়ে গেছে।
সায়ন বলল, রিনি, তোর মালপত্রগুলো নিয়ে নে। আমার আজ দুপুরেই একটা মিটিং আছে। আমি হোটেলে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়েই কাজে বসব। কখন শেষ হবে জানি না। বিকেলে এখানে এসে মিট করব।
সাহানা বলল, সায়ন, এই ক্যামেরাটা দ্যাখ তো। এটার কোনও ভ্যালু আছে কি না।
সায়ন ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। শাটার টিপল দু'বার। আপন মনে বলতে লাগল, ভাল জাতের ক্যামেরা। এখনও চালু আছে। এ রকম লেন্স এখন আর পাওয়া যায় না। এটা কার?
সাহানা আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, ওই ভদ্রলোকের। উনি এটা বিক্রি করতে চাইছেন। আমি এটা কিনব ভাবছি। আমার কাকাকে এটা গিফ্‌ট দিলে খুব খুশি হবে।
মধুজা বলল, এখন ডিজিটাল ক্যামেরার যুগে এটা দিয়ে কী হবে?
সায়ন বলল, যারা খাঁটি প্রফেশনাল, তাদের কাছে এসবের খুব কদর আছে এখনও। কত দাম চাইছে? এটা আমিও নিতে রাজি আছি।
সাহানা বলল, তোর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তুই একটু দর-দাম করে দ্যাখ না।
ওরা বিশ্বর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মিস্ত্রির সঙ্গে কথা থামিয়ে এদের দিকে তাকালেন।
সাহানা বলল, ইনি মিস্টার বিশ্বরঞ্জন রায়। এখানে অনেক দিন আছেন। আর এই আমার বন্ধু সায়ন মুখার্জি, এম বি এ কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার। আজকের জাহাজেই এসে পৌঁছেছে।
দু'জনেই হাত তুলে নমস্কার করলেন।
সায়ন বলল, আপনি এই ক্যামেরাটা বিক্রি করবেন? কত দাম এক্সপেক্ট করছেন?
বিশ্ব ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আমি কিছুই এক্সপেক্ট করছি না।
সায়ন একটু অবাক হয়ে বলল, আপনি এটা বিক্রি করবেন, মনে মনে একটা দামও ভেবে রেখেছেন নিশ্চয়ই?
বিশ্ব বললেন, না দামের কথা ভাবিনি। এমনিই, মানে, এটা এখন আমার কোনও কাজে লাগে না, তাই আমার কাছে আর রাখতে চাই না। কেউ যদি নিয়ে নিতে চায়।
—আমি নিতে পারি। ধরুন যদি হাজার পাঁচেক টাকা দাম ধরা যায়।
—অসম্ভব। আপনি বলছেন কী?
—তার মানে, আপনি আরও অনেক বেশি চান? কত?
—না, আমি তা বলছি না। এটা আমি অনেক দিন আগে কিনেছি, তখন দাম বেশ কম ছিল। ব্যবহার করেছি বহু বছর। সব দাম উঠে গেছে। এখন এটার বদলে অত টাকা...না, না, সেটা খুব অন্যায় হবে। আমি অত টাকা চাই না।
মধুজা হেসে ফেলে বলল, এটা তো বেশ মজার ব্যাপার। যে কিনবে সে দিতে চাইছে পাঁচ হাজার, আর যে বেচবে, সে বলছে, অত দাম নেবে না। সায়ন, তুই আর একটু দাম কমা তো। দেখি উনি—
এই সময় একটু দূর থেকে একজন মোটাসোটা গোলগাল লোক বলল, ও বিশ্বদা, কাল তাস খেলতে এলেন না? আমরা সবাই বসেছিলাম।
বিশ্ব বললেন, না, যাইনি। আমি তাস খেলা ছেড়ে দিয়েছি।
সেই লোকটি ভুরু কপালে তুলে বলল, সে কি, কবে থেকে ছাড়লেন?
—কাল থেকে।
—পরশুও তো আপনি...আপনার এমন নেশা যে নিজেই লোকজন জড়ো করতেন খেলার জন্য।
—অত নেশা হয়েছিল বলেই তো ছাড়লাম।
—এই তো কয়েক দিন আগে সিগারেটও ছাড়লেন?

—সিগারেটেও বেশি নেশা ছিল। তাই ছাড়তে হল।

—আর কত কী ছাড়বেন? এরপর?

—দেখি! ভাবছি মাছ-মাংসও ছেড়ে দেব!

—এ যে দেখছি সিরিয়াস কেস। ওই সাধুবাবার পাল্লায় পড়ে আপনিও সাধু হবেন নাকি!

—নাঃ, আমি আর কিছুই হব না। যেমন আছি তাই-ই যদি টিকিয়ে রাখতে পারি।

—খুব খেল দেখাচ্ছেন বটে!

সেই লোকটি চলতে শুরু করতেই বিশ্ব মুখ ফিরিয়ে বললেন, স্যরি, আপনাদের সঙ্গে কথার মাঝখানে...

সাহানাকে বললেন, দামের কথা এখন থাক। আপনার ক্যামেরাটা পছন্দ হয়েছে, আপনি এটা নিন না।

সাহানা থতমত খেয়ে বলল, আমি নিয়ে নেব? এমনি এমনি! তা আবার হয় নাকি! দাম না দিয়ে...।

বিশ্ব বললেন, ঠিক আছে দাম যদি দিতেই চান, একটা টাকা দেবেন। কই দিন!

সাহানা বলল, এক টাকা? আমার কাছে তো এখন নেই।

বিশ্ব বলল, ঠিক আছে, পরে দেবেন। চলে তো যাচ্ছেন না। আমার একটু কাজ আছে।

এক পাশে দাঁড়ানো মিস্তিরিটিকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

॥ ৪ ॥

বিকেল হয়ে এসেছে। একটা গাড়ি করে ঘুরছে সায়ন আর তিন যুবতী। সমুদ্রের ধারটা বাদ দিলে পোর্ট ব্লেয়ার শহরটার ভেতরের রাস্তা ও দোকানপাট মূল ভারত ভূখণ্ডের যে কোনও মফস্‌সল শহরেরই মতন।

মানুষজনের মধ্যে তামিল-তেলুগু আর বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু পাঞ্জাবিও চোখে পড়ে।

সাহানা একটা টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের লিফলেট পড়তে পড়তে বলল, এখানে লিখেছে, ফেমাস পর্যটক মার্কো পোলো নাকি আন্দামানে এসেছিলেন।

সায়ন গম্ভীর ভাবে বলল, গুল মেরেছে!

—তার মানে?

—অনেক ভ্রমণ কাহিনির লেখকই গুল মারে। যে-জায়গায় নিজে যায়নি, সেখানকার কথাও লিখে দেয়। ওই মার্কো পোলোও সেই টাইপের।

—তুই কী করে জানলি?

—ওর লেখা আমি পড়েছি। মার্কো পোলো লিখেছে যে এখানকার সব লোকদের দেহটা মানুষের মতন আর মাথাটা কুকুরের মতন। তাহলেই বুঝে দ্যাখ!

মধুজা বলল, বাঁদরের মতন বললেও একটা মানে বোঝা যেত। একসময় সাহেবরা আমাদের তো মাংকি বলেই। গালাগাল দিত।

সায়ন বলল, এই দ্বীপটার নামও তো হনুমান থেকে এসেছে। আন্দামান আর হনুমান প্রায় একরকম শোনাচ্ছে না?

রিনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, এই রে!

মধুজা বলল, কী হল?

রিনি ভয়-চকিত ভাবে বলল, ওই যে ভদ্রলোক, একজন মহিলা আর দু'টো বাচ্চার সঙ্গে দাড়িয়ে আছেন, ওই মিষ্টির দোকানটার সামনে, উনি তো আমার দাদার বন্ধু, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস। ঠিক ভেবেছি, কোনও না কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে।

সায়ন বলল, তাতে ভয় পাবার কী আছে? শোনো, তুমি যখন সাহস করে চলে এসেছ, প্লিজ মেনটেন দ্যাট সাহস। আজকালকার দিনে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে আসা কি অপরাধ নাকি?

রিনি বলল, না, তা নয়। ভাবছি, ঝোঁকের মাথায় হুট করে চলে এসেছি, এখন ভাবছি, বাবা শুনলে যদি খুব আঘাত পান, বাবার স্বাস্থ্য ভাল নয়।

সাহানা জিজ্ঞেস করল, তোর বাবা কি বাড়িতে ড্রেসিং গাউন পরেন?

রিনি বলল, না তো! এমনি পাজামা, পাঞ্জাবি। কেন?

সাহানা বলল, আগেকার বাংলা সিনেমায় সব বাবারা ড্রেসিং গাউন পরত আর মেয়ে তার অমতে বিয়ে করেছে শুনলেই বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক।

রিনি বলল, অ্যাই, বাজে কথা বলবি না। তুই ক'টা পুরোনো বাংলা সিনেমা দেখেছিস রে?

—টিভিতে দেখেছি দু'একটা।

সায়ন বলল, রিনি, তুমি যদি অতই উতলা হয়ে থাকো, তাহলে তোমাকে কালকেই প্লেনের টিকিট কিনে দিতে পারি। ফিরে যাও!

রিনি বলল, সায়ন, আমার সঙ্গে ওরকম কড়া গলায় কথা বোলো না প্লিজ। আমি তো তোমাদের সঙ্গে সময় কাটাতেই এসেছি। বাড়ির কথা ভেবে একটু তো দো-টানা হতেই পারে। তাতে তুমি যদি রাগ করো—

—স্যরি।

মধুজা বলল, হ্যাঁ, নামের কথা হচ্ছিল। চেন্নাই, মুম্বই, এমনকী কলকাতারও নাম পাল্টে গেছে, আর এই জায়গাটার নাম পোর্ট ব্লেয়ার রেখে দেবার কী মানে হয়?

সায়ন বলল, সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার-এর সময় জাপানিরা এই দ্বীপগুলো দখল করে নেয়। তারপর নেতাজি এসে আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেন। তিনি আন্দামান আর নিকোবরের নাম রাখেন 'শহিদ' আর 'স্বরাজ'। স্বাধীন ভারতবর্ষে আবার সে নাম দু'টো বদলে দেবার কী মানে হয়? এটা নেতাজিকে শুধু অগ্রাহ্য করা নয়। তাঁকে অপমান করা।

মধুজা বলল, পলিটিক্স ভাই, পলিটিক্স।

সাহানা বলল, এই, একটা ব্যাপারে আমার মনটা এখনও খচখচ করছে। গাড়িটা একটু ডান দিকে ঘোরাবি।

গাড়িটা কয়েক বার এঁকে বেঁকে এক জায়গায় থামল। নেমে এল সবাই।

এই শেষ বেলাতেও কয়েক জন মিস্তিরিকে নিয়ে জোর কদমে কাজ করছেন বিশ্ব। নৌকোটা প্রায় পুরো তৈরি হয়ে উঠেছে। আকারে ছোট হলেও মাঝখানটা সেকালের জাহাজের মতন মাস্তুল ও পাল খাটানো।

ওরা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল।

তারপর সায়ন বলল, বাঃ, বেশ দেখতে হয়েছে। আপনি কি এটা ভাড়া দেবেন?

কাজ না থামিয়েই বিশ্ব বললেন, না।

মধুজা বলল, ভাড়া দেবেন কেন? ওর তো টাকার দরকার নেই।

সায়ন বলল, সুন্দর দেখতে হয়েছে। এটাতে বেশ বেড়ানো যায়।

সাহানা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে ব্যাগসুদ্ধ ক্যামেরাটা বার করে বলল, মিস্টার রায়, কিছু মনে করবেন না। আপনি সকালে ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। এ ভাবে আমি কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে অভ্যস্ত নই।

বিশ্ব মুখ না তুলেই বললেন, ঠিক আছে, ওটা ওখানে রেখে দিন।

সাহানা ব্যাগটা একটা কাঠের পাটাতনের ওপর রেখে বলল, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আপনি যদি একটা রিজনেব্‌ল অ্যামাউন্ট নিতেন, তা হলে কোনও সমস্যাই থাকত না।

এ বারে কাজ থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বিশ্ব।

কিছুটা কঠোর ভাবে বললেন, সামান্য একটা ক্যামেরা, তা নিয়ে অত কথার কী দরকার? এটা দেখছি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আপনার এটা পছন্দ হয়েছে, আমি আপনাকে দিতে চেয়েছি, ব্যাস! সব সময় কি টাকার কথা তুলতেই হবে। আপনি সেভাবে এটা নিতে চান না, নেবেন না! এ নিয়ে আমি আর...

তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে, সবাইকে চমকে দিয়ে, ক্যামেরাটা ছুড়ে দিলেন সমুদ্রে।

আরে, আরে বলে চেঁচিয়ে উঠল সায়ন।

তারপর জুতো-টুতো না খুলেই সে ছুটে জলে নেমে গেল।

ক্যামেরাটা বেশি দূরে পড়েনি, চামড়ার কেস আছে বলে সঙ্গে সঙ্গে ডুবেও যায়নি।

সায়ন সহজেই সেটাকে উদ্ধার করে ওপরে উঠে এল।

বিশ্বর কাছে এসে ধমক দিয়ে বলল, আচ্ছা লোক তো আপনি। এরকম একটা জিনিস, আজকাল আর দেখাই যায় না, আপনি জলে ফেলে দিচ্ছিলেন? এটা একটা ক্রাইম।

বিশ্ব চুপ করে রইলেন।

সায়ন আবার একই ভাবে বলল, এটার মধ্যে জল ঢুকে গেলে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি রেগে-মেগে ছুড়তে গেলেন, তা বালির ওপরে ফেললেই তো পারতেন।

বিশ্ব শান্ত ভাবে বললেন, না, রাগ করিনি।

সায়ন বলল, যাই হোক, এটা এখন কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস। যে পাবে এটা তার। আপনার আর অধিকার রইল না, দাম-টামেরও প্রশ্ন রইল না।

সাহানা বলল, এই—

সায়ন তার দিকে হাত তুলে বলল, দেব দেব তোকেই দেব। আগে আমি দেখে নিই জল ঢুকে কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না।

গাড়ির দিকে যেতে যেতে সায়ন আবার ফিরে দাঁড়াল। তার ভুরু কুঁচকে গেছে।

বিশ্বর কাছে এসে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনাকে দেখার পর থেকেই কথাটা মনে হচ্ছে। আপনাকে বোধহয় আমি আগে কোথাও দেখেছি।

বিশ্ব বললেন, তা হতে পারে।

—কোথায়, ঠিক মনে করতে পারছি না। আপনি কি কখনও মুম্বইতে ছিলেন?

—না। আমি অনেক জায়গাতেই থেকেছি, কিন্তু মুম্বইতে কখনও থাকা হয়নি।

—আপনি কি আমাকে আগে কখনও দেখেছেন?

—তাও তো ঠিক মনে করতে পারছি না।

—হয়তো অন্য কারুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছি। আচ্ছা, চলি।

অন্যরা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, সায়ন ফিরে গেল সেখানে।

সায়ন উঠেছে ইস্টার্ন স্টার নামে ফাইভ স্টার হোটেলে। ওরা সবাই এল হোটেলের সেই ঘরে।

সায়ন বলল, আমি তোমাদের এখানেই রুম সার্ভিসে ডিনার খাওয়াব। কী কী খাবে ঠিক করো। আমি ততক্ষণ একটু কম্পিউটার চেক করি।

সে কম্পিউটারের সামনে বসল, তিন যুবতী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঘরখানা।

বেশ প্রশস্ত ঘর, সঙ্গে আছে বারান্দা, অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। বারান্দা দিয়ে অবশ্য সমুদ্র দেখা যায় না, গাছপালায় ঢাকা পড়ে গেছে।

একটা কাবার্ডের ওপর রয়েছে কয়েকটি পানীয়র বোতল।

সাহানা সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, এই সায়ন, আমি একটু ভড়কা নিতে পারি?

সায়ন বলল, হেল্প ইয়োরসেল্‌ফ। কেউ যদি ফ্রুট জুস চাস, কিংবা কেউ ওয়াইন খেতে চাইলে তাও আনানো যেতে পারে।

ঘরের ফ্রিজটা খুলে মধুজা বলল, এখানে অনেকরকম স্ন্যাক্স আর কোল্ড ড্রিংকস রয়েছে। এগুলোর খুব দাম নেয় তাই না?

সায়ন বলল, এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট। নো প্রবলেম।

সাহানা নিজেদের গেলাসে পরিমিত ভড়কা ও মিষ্টি পানীয় ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, সায়ন, তুই কিছু নিবি?

সায়ন বলল, একটা গেলাসে খানিকটা স্কচ আর বরফ দে।

কম্পিউটার দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোকের নামটা কী যেন?

মধুজা বলল, কার?

—ওই যে ক্যামেরা কাণ্ডের ভদ্রলোক।

—বিশ্বরঞ্জন রায়।

—নামটাও কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—এটা মোটেই আনকমন নাম নয়।

—তা অবশ্য ঠিক। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একজন রিপোর্টার আছে এই নামে।

—না, না, তার নাম আসলে বিশ্বনাথপ্রসাদ রায়। শুধু বিশ্ব রায় লেখে।

সায়ন আবার কম্পিউটারে মন দিল।

সাহানা বলল, কী রে মধুজা, তোর মুখখানা শুকনো ফ্যাকাশে লাগছে কেন রে? অমিতকে ফোনে পেলি? কাল আসছে তো?

মধুজা ঠোঁট উল্টে বলল, কী জানি! ঠিক বলতে পারল না। অফিসের নাকি এমন জরুরি কাজ পড়ে গেছে...

—অমিতই তো প্ল্যান করল প্রথমে। সায়ন অফিসের কাজে এখানে আসছে, সেই উপলক্ষে আমরাও ছুটি নিয়ে...দল বেঁধে না বেড়ালে ঠিক মজা লাগে না?

—দ্যাখ না, নিজে অত সব প্ল্যান করল। আর্মির কার সঙ্গে ওর চেনা আছে, হেলিকপ্টারে করে আমাদের ঘোরাবে, কোথায় কী. দু'দিন আগে আমাদের পাঠিয়ে দিল, এখন নিজেই আসতে পারছে না!

সায়ন বলল, আমি অমিতকে ই-মেল পাঠাচ্ছি। দেখি কী বলে। আমার অবশ্য মেয়াদ এখানে মাত্র চার দিন।

সাহানা গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, এমন স্পেশাল এই রুমটা, দু'টো আলাদা খাট। রিনি তুই এখানেই থেকে গেলে পারতি। এই তুলনায় আমাদের লজের ঘরগুলো শ্যাবি!

রিনি বলল, না, না, আমার ওখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

সাহানা বলল, অসুবিধে না হওয়া আর আরাম, দু'টোতে অনেক তফাত আছে।

রিনি বলল, আমি তোদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করব, সেটাই আমার বেশি ভাল লাগবে।

—শোন বোকা মেয়ে, কে দেখল না দেখল, কে কী ভাববে, এর চেয়ে জীবনের এই সব উপভোগের মুহূর্ত অনেক দামি। এখানে থেকে যা!

—না, কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

সাহানা একটা বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, তাহলে আমি আজকের রাতটা এখানে থেকে যাই? আই লাভ দা স্টাইলিস্ট কমফর্টস অফ লাইফ।

রিনি বলল, থাক না, থেকে যা।

সাহানা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বলল, আহা-হা। ভেতরটা হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে, আর মুখে শুকনো হেসে বলছিস, থাক না, থেকে যা!

রিনি বলল, যাঃ, এতে হিংসের কী আছে?

—সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ, একটা রাত থাকলে কী এমন হবে?

—এই এক রাতে আমি সায়নকে হয়তো পুরোপুরি চেটেপুটে খেয়ে ফেলতে পারি!

—যাঃ!

সায়ন কম্পিউটার থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার ঘরে আর কে থাকবে, না থাকবে, তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে! এ বিষয়ে আমার কোনও মতামত নেই বুঝি?

সাহানা তার গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, ইয়েস, কী তোর মতামত! এই বিছানাটায় যদি আমি আজকের রাতটা কাটাই, তোর আপত্তি আছে? বিছানাটা এমন টেমটিং।

সায়ন খুব বুদ্ধিমানের মতোন বিষয়টি অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, তোর মনে আছে, সাহানা, অনেক দিন আগে, আমরা দল মিলে গিয়েছিলাম হলদিয়ায়। কোন একটা কম্পানির গেস্ট হাউজে, লম্বা ডরমিটরিতে আমাদের থাকতে দিয়েছিল। ছেলেরা মেয়েরা দু'টো পাশাপাশি উইঙ্গ। সারা রাত আমরা গান গেয়ে কাটিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, মনে আছে। প্রায় তিন-চার বছর হয়ে গেল না?

—খাবারের অর্ডার দেবার আগে, একটা-দু'টো গান হয়ে যাক না। কে গাইবে প্রথমে।

সবাই নীরব।

সায়ন বলল, জানি। কেউ-ই প্রথম গাইতে চাইবে না। সবাই বড় বড় গায়ক। আমি তো গায়ক না, আমিই প্রথম শুরু করি।

সায়ন গাইতে লাগল, এমনি করে যায় যদি দিন যাক না।

মন উড়েছে, উড়ুক না রে, মেলে দিয়ে গানের পাখনা...

॥ ৫ ॥

ফিনিক্স বে জেটি থেকে টুরিস্টদের জন্য লঞ্চ ছাড়ে। সকাল থেকেই সেখানে ভ্রমণার্থীদের লাইন লেগে গেছে। আজকের দিনটাও সুন্দর, নির্মেঘ আকাশ। এখানকার আকাশে যখন মেঘ থাকে না, তখন বড় বেশি নীল মনে হয়। যেরকম নীল আকাশ দেখার অভ্যেস নেই কলকাতার মানুষদের।

এই জেটিতে কয়েকটি প্রাইভেট মোটর বোটও থাকে। সায়ন আর সঙ্গের তিন যুবতী সেরকম একটি মোটর বোটে উঠল।

তাদের অভ্যর্থনা জানাল এই বোটের মালিক জহির ইকবাল। তিনি বেশ বড়সড় চেহারার মানুষ, মাথায় বাবড়ি চুল। মুখে বেশ পুরুষ্ট গোঁফ ও থুতনিতে ফরাসি দাড়ি। শেরওয়ানির ওপর তিনি পরে আছেন একটা ওয়েস্ট কোট, বাঙালিরা যাকে বলে জওহর কোট।

জহির ইকবাল একটি কনস্ট্রাকশান কম্পানির মালিক, সায়নের সঙ্গে কর্মসূত্রে যোগাযোগ। সায়ন তাঁর সঙ্গে অন্যদের আলাপ করিয়ে দিল।

সে বলল, জহির সাহেব জন্ম থেকেই এখানে আছেন, যদিও কয়েক বছর দার্জিলিং-এর স্কুলে ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনো করে এসেছেন।

ভেতরের ক্যাবিনে বসার জায়গা আছে, বৃষ্টি ও রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচানো যায়, কিন্তু এরা কিছুক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল। রোদ্দুরের তেজ নেই, বরং বেশ নরম।

সাহানা বলল, জহির সাহেব, আমি যদি সিগারেট খাই, আপনি কিছু মনে করবেন?

জহির বললেন, নট অ্যাট অল, নট অ্যাট অল। যার যা খুশি, আমি দুপুরের জন্য বিয়ার আর জিন অ্যান্ড লাইমেরও ব্যবস্থা রেখেছি। ইন ফ্যাক্ট, আমি নিজেও একজন স্মোকার, খুব চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছি না।

দু'জনের সিগারেট ধরাবার পর সাহানা বলল, আপনি এই আয়ল্যান্ডের জন্ম থেকে আছেন, আপনার ফ্যামিলি নিশ্চয়ই মেনল্যান্ড থেকে এসেছে, এই জায়গাটা চুজ করলেন কী করে?

জহির বললেন, চুজ মানে... নট বাই চয়েস। আমরা আসলে উত্তরপ্রদেশের লোক। আমার গ্র্যান্ডফাদার এখানে কনভিক্ট হয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতার এক বছর আগে যখন তিনি মুক্তি পান, তখন সব কনভিক্টকেই অফার করা হয়েছিল, দেশে ফিরে যাবার ভাড়া আর কিছু অ্যালাউন্স পেতে পারে, অথবা এখানে কিছুটা জমি নিয়েও সেট্‌ল করতে পারে। আমার ঠাকুর্দা এখানে থেকে গেলেন। লখনউতে তাঁর বউ ছিল, তিনিও দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে পৌঁছে গেলেন এখানে।

মধুজা বলল, আপনার গ্র্যান্ডমাদার লখনউ শহরের মতন জায়গা ছেড়ে এরকম ধাধ্যাড়া গোবিন্দপুরে আসতে রাজি হলেন? স্বামীকে খুবই ভালবাসতেন বোঝা যাচ্ছে!

—ইয়েস, কীরকম প্রেম বুঝুন। আমার গ্র্যান্ডফাদার কিন্তু রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন না। কেউ একজন তাঁকে অনেক টাকা ঠকিয়ে ছিল, তাই রাগের মাথায় তাঁকে গুলি করে বসেন। আমার ঠাকুমার যে শুধু প্রেম ছিল তাই-ই নয়, বুদ্ধিও ছিল খুব। তিনি বুঝেছিলেন, ছাড়া পাবার পরে তাঁর স্বামী লখনউ ফিরে গেলে সেখানেও তাঁর বিপদ হতে পারে। দশ-কুড়ি বছর পরেও কেউ কেউ রিভেঞ্জ নেয়।

—হ্যাঁ, এরকম শুনেছি।

—আমার ঠাকুমা বেশ কিছু ক্যাশ এনেছিলেন, তাই দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা। এখানে কাঠের ব্যবসায় সাকসেসফুল হয়েছেন বেশ কয়েকজন, আমার বাবা তাঁদের একজন।

—আপনারা ইউ পি'র লোক, আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কোথায়?

—সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা এখানেই বিয়ে করলেন এক রিফিউজি বাঙালি মেয়েকে। সেই থেকে আমরাও ভেতো বাঙালি হয়ে গেলাম। মাতৃভাষা অফকোর্স বাংলা। আমার মা বেশ তেজি মহিলা। এখনও কী বলে জানেন, মোছলমানগো ভয়ে দেশ ছাইড়া পলাইয়া আইলাম, তারপর এক মোছলমানেরই খপ্পরে পড়লাম! আমার কপালে এই ছিল? হা-হা-হা-হা!

—মানুষের জীবন, সত্যি, ভারী অদ্ভুত।

—একদিন আমার বাড়িতে নিয়ে যাব, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করবেন। মা ওই কথা বলেন তো, হিন্দু ছিলেন, অথচ এখন তিনি আমাদের চেয়েও বেশি মুসলমান। কেউ তাঁকে জোর করে না, অথচ প্রতিদিন সকালে উঠে কিছুটা কোরান পাঠ না করে কোনও কিছু মুখে দেন না। তাহলেই বুঝুন, মানুষের জীবন সত্যিই বিচিত্র কি না। এক একজন মানুষ যেন এক একটা নতুন নতুন দ্বীপ।

—আপনারা ক'ভাই বোন?

—জাস্ট দুই ভাই। আমার বড় ভাই এখানে থাকেননি, তিনি দিল্লিতে সেট্‌ল করেছেন, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের অফিসার। আমারও ছাত্র বয়েসে একবার মনে হয়েছিল, সব বিক্রি করে মেনল্যান্ডে চলে যাই, তাতে এমনি কোনও অসুবিধেও ছিল না। কিন্তু এই সমুদ্রের টানে, এখানেই বেশি ভাল লাগে। এখন আমি কাজের জন্য কখনও কখনও তো দূরে যাই, বেশি দিন থাকতে পারি না। সমুদ্র আমাকে ঘুমের মধ্যে ডাক পাঠায়।

সায়ন বলল, আমারও ইচ্ছে করে, এরকম কোনও সমুদ্রের ধারে এসে থাকি।

রিনি বলল, তুমি পারবে না। তুমি এত রকম ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছ।

সায়ন বলল, এখানে আমি যে প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি, এটা তো আমারই ব্রেন চাইল্ড। আমার কম্পানি প্রথমে ইন্টারেস্টেড ছিল না।

সাহানা জিজ্ঞেস করল, তোদের প্রজেক্টটা একজ্যাক্টলি কী বল তো? ঠিক খুলে বলছিস না। গোপন কিছু ব্যাপার নাকি?

সায়ন বলল, এখন আর গোপন কিছু নেই। এখানে মায়া বন্দর বলে একটা জায়গা আছে।

সাহানা বলল, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। ভারী সুন্দর নাম, মায়া বন্দর! যেন রূপকথার মতন।

—শুনতে যত মিষ্টি, আসলে জায়গাটা সেরকম কিছু না। নট মাচ অফ আ পোর্ট। ওখানে একটা প্রপার বন্দর গড়ে তোলা যায় কি না, সেই কথাই ভাবা হচ্ছে। আমরা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করছি।

—তাহলে তো তোকে এখানে এসে থাকতে হবে?

—আমার নিজের থাকার খুব একটা দরকার নেই? আসল কাজ অন্য লোক করবে। তবে, আমি বলেছি, আমি মাঝে মাঝেই এসে কিছু দিন থেকে সুপারভাইজ করব। তারপর বন্দরটা তৈরি হয়ে গেলে, ওখানেই একটা বাড়ি তৈরি করে থেকে গেলে কেমন হয়? রিনি, তুমি থাকতে পারবে না?

—কেন পারব না? এত সুন্দর পরিবেশ।

সাহানা বলল, ও এখন মুখেই বলছে। দু'দিন পরেই হাঁপিয়ে উঠবে। ওর থিয়েটার গ্রুপ আছে, টিভি সিরিয়াল আছে...। প্রকৃতি বেশি দিন সহ্য হয় না, বুঝলি! আমরা শহুরে মানুষ।

লঞ্চটা বেশ জোরেই ছুটছে হারবার্টাবাদ নামে একটা জায়গা ছাড়িয়ে মধ্য আন্দামানের দিকে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নির্জন দ্বীপ। ঠিক ছবির মতন। কোনও কোনওটাতে একটু একটু বেলাভূমিও রয়েছে, কিন্তু জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই। জঙ্গল দেখলে মনে হয় অনাদিকাল থেকে একই রকম আছে!

মধুজা জিজ্ঞেস করল, এরকম মিষ্টি মিষ্টি দ্বীপে কেউ বাড়ি বানিয়ে থাকে না কেন?

জহির ইকবাল বললেন, ড্রিংকিং ওয়াটার পাবে কোথায়? সমুদ্রের পানি তো খাওয়া যায় না।

সাহানা বলল, ছোটবেলায় আমরা কার যেন কবিতা পড়েছি, ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, বাট নট আ ড্রপ টু ড্রিংক!

মধুজা বলল, কোলরিজ।

রিনি বলল, আমরা এমনি একটু এই একটা দ্বীপে কিছুক্ষণ থাকতে পারি না?

জহির বললেন, তা পারা যায়, কিন্তু বোটটাকে তো একেবারে ধারে লাগানো যাবে না। একটু জলে নামতে হবে, শাড়িটাড়ি ভিজে যাবে।

মধুজা বলল, তা যাক না। চলুন, চলুন, নামব।

চালকের নাম মনিরুদ্দিন। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল। সায়ন আর জহির আগে নেমে গিয়ে ধরে ধরে নামাতে গেল মেয়েদের। সাহানা অবশ্য পুরুষদের সাহায্য না নিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিজেই।

বালি এখানে অতি মসৃণ, প্রায় সাদা রঙের। কিছু কিছু ঝিনুক পড়ে আছে। সাহানা একটা শাঁখও পেয়ে গেল।

মধুজা বলল, দেখি, দেখি, সত্যি সত্যি শাঁখ! তুই কি লাকি রে সাহানা!

সাহানা বলল, এটা তুই নে। তোর বর আসেনি।

বোট থেকে নামানো হল শতরঞ্চি, কয়েকটা জলের বোতল, বাস্কেট ভর্তি স্যান্ডুইচ ও আলুভাজা আর সুরাজাতীয় পানীয়।

পেছনের গাঢ় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রিনি একটু চুপসে যাওয়া গলায় বলল, এখানে সেরকম ভয়ের কিছু নেই তো? কোনও জন্তু-জানোয়ার?

জহির বললেন, বাঘ-ভাল্লুক নেই। ছোট ছোট শুয়োর থাকতে পারে,

তাও ভয় পাবার মতন কিছু না। সাপ আছে, কিন্তু তেড়ে আসবে না।

সায়ন বলল, আর হাতি? হঠাৎ যদি হস্তিদর্শন হয়?

তিনটি মেয়েই অবাক হয়ে বলল, এখানে হাতি আছে? যাঃ!

জহির বলল, সত্যিই কিন্তু হাতি আছে। এমনিতে মনে হতেই পারে যে দ্বীপে হাতি আসবে কী করে? মেনল্যান্ড থেকে এক সময় অনেক হাতি আনা হয়েছিল।

—কেন?

—কাঠের ব্যবসায় হাতি খুব কাজে লাগে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি বইতে পারে হাতি। একটা কম্পানিই হাতিগুলো আনিয়েছিল! কয়েক বছর পর সেই কম্পানিটা ফেল পড়ে। উঠে যায়। তখন হাতিগুলোকে নিয়ে কী করবে? জাহাজে ফিরিয়ে নিতে গেলেও অনেক খরচ। তাই হাতিগুলো জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গেল। জঙ্গলে গিয়ে সেই সব পোষা হাতিই ক্রমে হয়ে গেল জংলি।

—ওরা কোন্ জঙ্গলে থাকে?

—সব জায়গায় নিশ্চয়ই যেতে পারবে না।

—কেন পারবে না? হাতি যে সাঁতার জানে। অত বড় দেহ নিয়ে ওরা কী করে সাঁতার কাটে, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। এই জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটা হাতি বেরিয়ে এলে অবাক হবার কিছু নেই।

—এই, ও কথা বলবেন না। শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছেন, বুঝতে পারছি।

মধুজা জিজ্ঞেস করল, আর জারোয়া? তারা তো খুব হিংস্র হয়।

জহির বললেন, এখন আর তত হিংস্র নেই। মাঝেমাঝে নিজেদের জায়গা ছেড়ে বাইরে আসে, জিনিসপত্র চায়, রাত্তিরবেলা কিছু কিছু চুরিও করে।

সায়ন বলল, এখনও খুবই হিংস্র সেন্টিনেলিজরা। তাদের দ্বীপে কেউ নামতেই পারে না। অমনি আক্রমণ করে।

মধুজা জিজ্ঞেস করল, তাদের দ্বীপ কোথায়?

সায়ন বলল, কী জানি, এটাই নাকি!

—ধ্যাৎ! ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে!

খাবারের প্যাকেট বিলি হতে লাগল নিজেদের মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে সাহানা ছাড়া অন্য কেউ অ্যালকোহলিক পানীয় নিল না।

বেশ কিছুটা দূরের সমুদ্রে কাছাকাছি অনেকগুলো মোটর বোট দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সাহানা জিজ্ঞেস করল, ওখানে কী হচ্ছে? মাছ ধরছে নাকি?

জহির বললেন, স্নরকেলিং করছে। আপনারা যাননি ওখানে?

—না।

—সে কি, তাহলে তো আপনারা এসে আন্দামানের আসল জিনিসটাই দেখেননি।

—আমরা সায়নের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। স্নরকেলিং ব্যাপারটা ঠিক কী যেন?

—ওখানে কোরাল রিফ রয়েছে। জলে নেমে দেখা যায়। সে কি অপূর্ব দৃশ্য, ডিভাইন বলা যেতে পারে। যারা এক্সপার্ট, তারা মুখে অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে স্কুপ ডাইভিং করে। আর যারা তা পারে না, তারা চোখে ম্যাগনিফাইং গগল্স লাগিয়ে ডুবসাঁতার কেটেও অনেকটা দেখতে পারে। কাল অবশ্যই দেখতে যাবেন। লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স। অনেক বিদেশি তো এটা দেখার জন্যই আসে।

মধুজা বলল, চলুন না, আজই আমরা ওখানে যাই।

জহির বললেন, আজ তো মুশকিল। আমার কাছে ওসব ইকুইপমেন্ট নেই। তাছাড়া শাড়ি-টাড়ি পরে সাঁতার কাটবেন কী করে? সুইমিং সুট কিংবা বেদিং কস্টিউম লাগবে।

সাহানা বলল, এই রে, আমি যে সাঁতার জানি না! শেখা হয়নি আর কি!

রিনি বলল, আমিও ভাল জানি না। সমুদ্রে নামতে ভয় করবে। মধুজা ভাল জানে, একবার লেকের সুইমিং ক্লাবে জলের মধ্যে কী একটা নাটক করেছিলি না?

জহির বললেন, সাঁতার না জানলেও একটা উপায় আছে। এখানে অনেক ট্যুর অপারেটর আছে। তাদের কারুর সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের গ্লাস বটম্ বোট আছে। বোটের তলাটা কাঁচের। সেখান দিয়ে সমুদ্রের তলার কিছু কিছু দেখা যায়। এখানকার জল তো খুব ক্লিয়ার। তবে, তাতেও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতন। নীচে না নামলে...যারা সাঁতার জানে না, তারা যদি সাহস করে নামতে পারে, তাহলে একজন গাইড তাকে শক্ত করে ধরে খানিকটা নীচে নিয়ে যায়। এমন রঙের খেলা দেখবেন!

সাহানা বলল, একজন কেউ জলের তলায় আমায় ধরে থাকবে, সেটা আমি ঠিক পারব না। অচেনা লোকের ছোঁয়া, তাতে আমার গা গুলোয়।

রিনি বলল, পুরির নুলিয়াদের মতন।

সাহানা বলল, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

জহির বললেন, আপনারা তো গীতাঞ্জলি লজে আছেন? ওখানেই থাকেন বিশ্বরঞ্জন রায়। ওঁকে বলে যদি সঙ্গে আনতে পারেন, হি ইজ আ গ্রেট সুইমার। ওঁকে আমি ডিপ সি-তে সাঁতার কাটতে দেখেছি।

মধুজা বলল, উনি কি আর আসবেন? উনি আমাদের পাত্তাই দেন না। হয়তো বলবেন, সাঁতার ছেড়ে দিয়েছি। উনি নাকি একে একে সবই ছেড়ে দিচ্ছেন।

জহির বললেন, হ্যাঁ, কিছুটা খেয়ালি মানুষ।

সায়ন জিজ্ঞেস করল, উনি এখানে অনেক দিন আছেন? কী করেন?

জহির বললেন, কিছুই তেমন করেন না। আমি মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে তাস খেলেছি। তখন আমাকে বলেছেন, একসময় অনেক কিছু করেছেন, এখন আর কিছুই করতে চান না। এখন শুধু ছুটি।

সে গেলাস হাতে নিয়ে উঠে গেল।

মধুজা বলল, জহির সাহেব, আপনি।

জহির বললেন, ওসব সাহেব-টাহেব নয়, প্লিজ। শুধু জহির বলুন, আর বয়েসে কিছুটা বেশি বলে যদি শুধু নাম ধরে ডাকতে সঙ্কোচ হয়, তাহলে জহিরদা বলতে পারেন।

মধুজা বলল, জহিরদা, আপনি তখন বললেন তো যে আপনার ঠাকুর্দা এখানকার সেলুলার জেলে ছিলেন? আমারও ঠাকুর্দা, মানে ঠিক বাবার বাবা নন, আপন ঠাকুর্দার জ্যাঠতুতো দাদা, মানে একই ফ্যামিলির, তিনি ছিলেন এই জেলে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্তদের সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন।

জহির বললেন, কী নাম?

মধুজা বলল, সত্যব্রত চক্রবর্তী। ওঁর লেখা বইও আছে। শুনেছি, যাদের যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়েছিল, তাঁদের নামের একটা লিস্ট টানানো আছে এই জেলের মধ্যে?

—হ্যাঁ, আছে তো। বাঙালির নামই বেশি। বীর সাভারকর এই জেলেই ছিলেন জানেন তো?

—আমার বাবা বলেছেন, সেই লিস্টটার একটা ছবি তুলে নিয়ে যেতে। এখানে তো একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-ও হয়। সেটাও দেখতে হবে।

সায়ন বলল, চলো, এবার ওঠা যাক। যদি মায়া বন্দর পর্যন্ত যাওয়া যায়। একবার দেখে আসতে চাই।

জহির বললেন, মায়া বন্দর পৌঁছোতে পারি, কিন্তু এর মধ্যে যদি ঝড় বৃষ্টি হয়, তাহলে হয়তো রাত্তিরে ফেরা নাও যেতে পারে। তাহলে ওখানেই থেকে যেতে হবে।

সায়ন বলল, থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে?

জহির বললেন, সেরকম ক্লাসি কিছু নেই। কোনও রকমে মাথাগোঁজার জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

রিনি বলল, নোংরা-টোংরা জায়গা হলে থাকতে পারব না। সেরকম দরকার হলে এই বোটেই তো থাকতে পারি। রাত্তিরে ঘুম হবে না। গল্প করে কাটিয়ে দেব।

সায়ন বলল, আমার ফেরা দরকার। চলুন তো, খানিকটা এগিয়ে দেখা যাক!

রিনি বলল, সাহানা কোথায় গেল? সাহানা!

মধুজা ভয়ার্ত গলায় বলল, ও'মা, দেখেছ! জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে।

দু'তিনজন চেঁচিয়ে কয়েকবার ডাকল, সাহানা, এই সাহানা!

সে যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

মধুজা বলল, এই রে, ওর বোধহয় নেশা হয়ে গেছে। মাথায় ভূত চেপেছে।

সায়ন মুখের দু'দিকে হাত দিয়ে আরও জোরে সাহানা বলে ডাকল।

সাহানা এবার পেছন ফিরে দেখল। তার মুখে হাসি। সে দৌড়ে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

॥ ৬ ॥

নৌকো-জাহাজটা তৈরি হয়ে গেছে, ছোট হলেও দেখাচ্ছে জাহাজেরই মতন। বিশ্ব ও কয়েকজন মিস্তিরি একসঙ্গে সেটাকে ঠেলে নামাচ্ছে জলে। ভেলুও এসে হাত লাগিয়েছে তাদের সঙ্গে।

খুব বেশি পরিশ্রম করতে হল না, বেশ সহজ ভাবেই সেটা জলে নেমে গেল। হাততালি দিয়ে উঠল ভেলু।

কারবাইন্স কোভ-এর বিচ থেকে এই জায়গাটা খানিকটা দূরে। এদিকে বিশেষ লোকজন আসে না। কিছুটা গাছপালার আড়াল আছে।

বিশ্ব লাফিয়ে উঠে পড়ে দেখতে লাগলেন ঠিক মজবুত হয়েছে কি না।

ভেলুও উঠে এল, তার সঙ্গে একজন মিস্তিরি।

মিস্তিরিটি বলল, মোটর লাগাবেন তো স্যার? নাকি হাল-দাঁড় রাখবেন? আজকাল সবাই ভটভটি চালায়।

বিশ্ব বললেন, সে আমি পরে ঠিক করব।

ভেলু জিজ্ঞেস করল, কবে রওনা হবে গো বাবু?

বিশ্ব বললেন, রওনা? কোথায় রওনা হব?

ভেলু বলল, অনেক দূরের কোনও একটা দ্যাশে, যে দ্যাশ আগে কেউ দেখে নাই।

বিশ্ব সহাস্যমুখে বললেন, এসব কথা তোকে কে বলল?

—আমার খুব যাইতে ইচ্ছা করে। আমারে লেবেল তো?

—তুই কী করে যাবি? ম্যানেজারবাবু তোকে ছুটি দেবে না।

—তুমি বলে দিলে ছুটি দেবে। তোমারে ভয় পায়।

—তোর জন্য ওকে আমি ভয় দেখাতে যাব কেন? নাঃ, আমাকে একাই যেতে হবে।

—আর কেউ সাথে যাবে না?

—কেউ না। তুই নাম এবার।

তিনি নিজেও নেমে পড়লেন এক কোমর জলের মধ্যে। নৌকোটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন এমন ভাবে, যেন আদর করছেন।

একটা লম্বা দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধা রইল একটা গাছের সঙ্গে।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকাল সাতটা।

গাড়ি থেকে নামল সায়ন, গীতাঞ্জলি লজের সামনে। একা।

কাউন্টারের পেছনে একটা গণেশের মূর্তিতে মালা পরাচ্ছেন ম্যানেজার।

সায়ন সেখানে এসে, মেয়েদের খোঁজ না করে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার বিশ্বরঞ্জন রায় কি ঘরে আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

ম্যানেজার বলল, তিনি তো এখন রুমে নাই। হোটেলের পিছন দিকে দেখেন একটা পাথরের বেঞ্চি আছে। উনি সকালবেলা সেখানে বসে থাকেন।

—ওখানে দেখা করতে গেলে বিরক্ত হবেন না তো?

—তা আমি কী করে কবো বলেন? ওনার মুডের ব্যাপার

—উনি ধ্যান-ট্যান করেন নাকি?

—ধ্যান? ঘোর নাস্তিক, ঘোর নাস্তিক! গিয়ে দেখতে পারেন।

সায়ন বেরিয়ে গেল। হাতে তার একটা বড় চামড়ার ব্যাগ।

হোটেলের পেছন দিকে খানিকটা জমি আছে বটে, সেখানে বাগান করার চেষ্টাও হয়েছিল এক সময়, এখন আগাছাতেই ভর্তি।

একটা পাথরের বেঞ্চে শিরদাঁড়া সোজা করে একা বসে আছেন বিশ্ব। আজকের আকাশ মেঘলা। ট্রি ট্রি ট্রি করে দূরে একটা পাখি ডাকছে।

ধ্যান করেন না বিশ্ব, কিন্তু ধ্যানীর মতনই বসে আছেন চোখ বুজে।

সায়ন দু'বার গলা খাঁকারি দিল। বিশ্ব তা শুনে মুখ ফেরাতেই সায়ন খুবই বিনীত ভাবে বলল, মাপ করবেন, আপনি যদি খুব বিরক্ত না হন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারি?

—হ্যাঁ, বলুন।

—আপনি কি রমেন্দ্রনাথ মিত্র বলে কারুকে চেনেন? চন্দননগরে বাড়ি।

—চন্দননগর, রমেন মিত্র, হ্যাঁ, চিনি। তাঁর সঙ্গে আমার দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তাও আছে। কোনও এক ভাবে আমার মাসতুতো দাদা হন।

—আপনি এক সময় আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে খুব আসতেন।

—আপনাদের বাড়ি? ও বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

—রমেন্দ্রনাথ মিত্র আমার বাবা

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বিশ্ব কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সায়নের দিকে। সেই তুলনায় উত্তেজনা ও উৎসাহ ফুটল না তাঁর গলায়। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, তুমি রমেনদার ছেলে?

সায়ন আরও এগিয়ে এসে বলল, আমি একটু বসতে পারি?

বিশ্ব বললেন, অবশ্যই!

বসবার পর সায়ন বলল, আমি আপনাকে কখনও মিট করিনি। আমার জন্মের পর আপনি আর বোধহয় যাননি চন্দননগরে।

বিশ্ব বললেন, আমি এক সময় সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছিলাম।

সায়ন বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার এক পিসি খুব গল্প করত আপনার। আমরা মণিপিসি বলি, তখন তার বয়েস ছিল তেরো-চোদ্দো, তাকে আপনার মনে আছে?

বিশ্ব একটু একটু মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, মণিমালা। সে বোধহয় তখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ত।

—মণিপিসির এমনই উচ্ছ্বাস, খুব সম্ভবত আপনার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল!

—ওই বয়েসে...উচ্ছ্বাস টুচ্ছ্বাস বেশিই হয়

—আপনিও ওই বয়েসে দারুণ হিরো ছিলেন, একটা স্পোর্টস কার চালিয়ে চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে।

সায়নের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ছবি। চন্দননগরের একটা বাগানওয়ালা বাড়ির গেটের সামনে থামল একটা রেসিং কার। সেটা চালাচ্ছে লাল গেঞ্জি পরা যুবা বয়েসের বিশ্ব।

বিশ্ব বললেন, না, না, আমি রেসিং কার কখনও চালাইনি। আমার বাবার একটা মরিস গাড়ি ছিল। সেটা আমিই চালাতাম।

এবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই একই দৃশ্য। রেসিং কারের বদলে হুড খোলা মরিস গাড়ি। লাল গেঞ্জির বদলে ফুল ফুল ছাপ দেওয়া শার্ট পরা।

—আপনাদের জাহাজের ব্যবসা ছিল?

—না, না। জাহাজের ব্যবসা করার মতন কোমরের জোর ক'টা বাঙালির আছে? রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দার পর আর কারুর সে জোর হয়নি। আমরা ছিলাম স্টিভেডর।

—ও, আপনারা বিদেশি জাহাজ এলে মাল খালাস করার একচেটিয়া কনট্রাক্ট পেতেন। সে তো ভাল ব্যবসা!

—হ্যাঁ, ভালই ছিল। তখনও অনেক বিদেশি জাহাজ আসত কলকাতায়।

—আমার মণিপিসি বলত কেন, আপনি নিজে একটা জাহাজও কিনেছিলেন?

—একটা জাহাজ কেনার ইচ্ছে ছিল খুব। হয়ত সেই গল্প করতাম মণিমালার কাছে। শেষ পর্যন্ত কিনতে পারিনি।

—আপনি যখনই যেতেন, নানান রকম উপহার নিয়ে যেতেন।

—নানান রকম নয়। আমি জাহাজ থেকে বিদেশি চকোলেট পেতাম।

এবারে চামড়ার ব্যাগটা খুলল সায়ন। কয়েকটা ছবির প্রিন্ট বার করতে করতে বলল, মণিপিসির ছেলে পার্থ দিনরাত কম্পিউটার নিয়ে খেলা করে। ওকে লিখেছিলাম, আমাদের ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে কয়েকটা ছবি পাঠাতে। কাল রাত্তিরেই পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখবেন ছবিগুলো?

বিশ্ব ঝুঁকে এলেন সায়নের দিকে।

সায়ন বলল, এই দেখুন, বাবা আর মা, পাশে শান্তা মাসি। এটা আমাদের বাড়ির পেছনে। মা একটা কদমগাছের চারা পুঁতছেন, চারাটা এখন অনেক বড় হয়েছে। এই যে, এটাতে মণিপিসি, তার পাশে কে চিনতে পারছি না।

বিশ্ব বললেন, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে।

সায়ন বলল, এই ছবিগুলো বোধহয় আপনারই তোলা। আমি যে ছবিগুলো পেয়েছি, তার মধ্যে মাত্র দুটোতে আপনি আছেন, অন্য কেউ শাটার টিপে দিয়েছে, বাকিগুলো আপনি তুলেছেন। আর...

একটু থেমে, বিশ্বর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সে জিজ্ঞেস করল, যে লাইকা ক্যামেরাটা নিয়ে এত কাণ্ড হল, ছবিগুলো নিশ্চয়ই সেই ক্যামেরাটাতেই তোলা?

বিশ্ব লাজুক মুখে বললেন, খুব সম্ভবত। অবশ্য আমার আরও দু' একটা ক্যামেরা ছিল। তোমার বাবা কেমন আছেন?

সায়ন বলল, ভাল নেই। অ্যালজাইমারে ভুগছেন, ঠিক মতন মানুষ চিনতে পারেন না। আমাকেও...আমি অবশ্য চন্দননগরের বাড়িতে যাই-ই খুব কম। আমি থাকি মুম্বই।

—মণিমালার কোথায় বিয়ে হয়েছে?

—মণিপিসি থাকেন দুর্গাপুরে। পিসেমশাইয়ের ওখানে বিজনেস আছে। তবে ওদের ছেলে পার্থ আছে আই আই টি সেক্টরে, সল্টলেকে।

—আর তোমাদের এক কাকা ছিল, থিয়েটার করত।

—দীপুকাকা মারা গেছেন। আপনি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন না?

—বৌদি সম্পর্কে কী যেন শুনেছিলাম।

—ঠিকই শুনেছিলেন। আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার সেপারেশন হয়ে যায়, আমার জন্মের কিছু দিন পরেই। তারপর মা মুম্বই চলে আসেন। আমি হচ্ছি, ভেরি মাচ মাই মাদার্স চাইল্ড। মায়ের কাছেই আগাগোড়া মানুষ হয়েছি। বাবার কাছে গেছি কয়েকবার, কিন্তু, মানে, ঠিক সহজ সম্পর্ক হয়নি বাবার সঙ্গে। মা এমনিতে সুস্থই আছেন। আপনি যদি কখনও মুম্বই আসেন...

—সে সম্ভাবনা খুবই কম।

—তাহলে...আপনি বসুন...আমি দেখি, মেয়েরা কী করছে। ছবিগুলো আপনার কাছেই রেখে যাই!

—না, না, তুমি নিয়ে যাও। আমি এ সব ছবি দিয়ে কী করব।

—এগুলো প্রিন্ট। আপাতত থাকুক আপনার কাছে। দেখুন যদি নস্টালজিয়া হয়। আমি আসছি একটু পরে। ব্যাগটাও থাক।

সায়ন চলে যাবার পর বিশ্ব একটা ছবি তুলে নিলেন।

সায়নের মা সুধার কদম চারা পোঁতার ছবি। দেখতে দেখতে ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল। সুধা চারাটা পুঁতছেন, একটু দূরে ক্যামেরা হাতে যুবক বয়েসের বিশ্ব। তাঁর পাশে কিশোরী মণিমালা। একজন মালি ঝারিতে করে জল এনে দিতে লাগল সেখানে।

সুধা বললেন, গাছটা বাঁচবে তো? আমার ভয় হয়!

মালি বলল, হ্যাঁ মা, বাঁচবে। নিশ্চয়ই। আপনার হাতের ছোঁয়া লেগেছে, নিশ্চয় বাঁচবে। রোজ একটু জল দেবেন।

মাটি মাখা হাতে সুধা উঠে দাঁড়ালেন।

বিশ্ব বললেন, আমি যা বলতে চাইছিলাম, মালি সেটা আগেই বলে দিল।

সুধা ভুরু তুলে বললেন, কোন্ কথাটা?

বিশ্ব বললেন, ওই যে আপনার হাতের ছোঁয়া লেগেছে, গাছটা ঠিক বেঁচে যাবে।

সুধা বললেন, আহা-হা! এরপর যা করার তো মালিই সব করবে।

মণিমালা বলল, আমিও একটা গাছ পুঁতব। বিশ্বদা আমারও ছবি তুলে দেবে।

মালি বলল, আজ তো গাছ নাই। কাল আনবোখন।

মণিমালা বলল, আমার গোলাপ ফুলের গাছ চাই।

মালি বলল, অন্য সব গাছ বাঁচানো যায়, গোলাপ গাছ বাঁচানো সহজ নয়।

মণিমালা বলল, কেন?

মালি বলল, রোজ গার্ডেনের জন্য আগে বেড বানাতে হয়।

সুধা বললেন, বেড? বেড বলে বুঝি?

আর একটি ছবিতে খাবার টেবিলের দৃশ্য। সে ছবির মধ্যেও বিশ্ব নেই। রমেন, তার ছোট ভাই দীপেন, আর একটি দম্পতি, মণিমালা, দু' হাতে পাতলা গ্লাভ্স পরা সুধা, একটা কিছু রান্নার গোল পাত্র ধরা। নেপথ্য থেকে বিশ্ব বললেন, বউদি, এ দিকে তাকান। রমেনদা, তুমি দীপেনকে আড়াল করে দিচ্ছ।

ক্লিক হল দু'বার।

দীপেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিশ্বদা, তুমি এবার বসো। আমি একটা ছবি তুলে দিই।

এবার বিশ্ব এসে বসলেন মণিমালার পাশে।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে রমেন মণিমালাকে বললেন, এই, তুই আগেই খেতে শুরু করলি যে? তোর বউদিকে একটু সাহায্য কর!

সুধা বললেন, না, না, ওকে কিছু করতে হবে না। পূর্ণিমাই তো রয়েছে!

একজন মহিলা অন্যান্য রান্না এনে সাজাল টেবিলে।

স্মৃতিতে যেমন হয়, খাবার টেবিলের ছবিটা মুছে গিয়ে, বিশ্বর চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্য ছবি। চন্দননগরের গঙ্গার ধারে তিনি বেড়াচ্ছেন সুধা, মণিমালার সঙ্গে। মণিমালা বিশ্বর হাত ধরে আছে।

আবার ছবিটা ফিরে এল খাবার টেবিলে। অন্য দম্পতির মধ্যে পুরুষটি বসল, প্রত্যেকটা আইটেমই দারুণ হয়েছে। সবই সুধার রান্না?

সুধা বললেন, না, না।

রমেন বললেন, সুধা তো রোজ রান্না করে না। মাঝে মাঝে এক একটা স্পেশাল ডিশ্...এই দই-ভেটকিটা সুধা রেঁধেছে।

ভদ্রলোকটি বললেন, তাই বলুন! সবগুলোই খেতে ভাল হয়েছে, কিন্তু এই মাছটা একেবারে আলাদা, স্পেশাল টাচ।

বিশ্ব বললেন, এই রে, আপনি এটা আগেই বলে দিলেন? আমিও খেতে খেতে ভাবছিলুম, অন্য রান্নার সঙ্গে এই মাছ রান্নাটা, একেবারে আলাদা।

সুধা হেসে বললেন, এই রকম বলতে হয়। সবাই বলে। দই-মাছ রান্না খুবই সোজা।

রমেন বললেন, সুধা তুমি এবার বসে পড়ো। আমরা সবাই নিয়ে নেব।

সুধা বললেন, আগে মাংসটা দিয়ে নিই।

বিশ্ব বললেন, আমি মাছটাই আর একবার নেব।

অতীতের দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। পাথরের বেঞ্চে বসে আছেন বর্তমানের প্রৌঢ় বিশ্ব। ফটোগ্রাফগুলো পাশে রাখা, একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বিশ্ব দেখতে লাগলেন অন্য দৃশ্য।

একটা বারান্দার এক পাশে মণিমালা ছবি আঁকছে আর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিশ্ব। সুধা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দার অন্য প্রান্তে।

মণিমালা বলল, এইবার আমি তোমার পোর্ট্রেট আঁকব।

বিশ্ব বললেন, আমাকে আঁকতে হবে না। তুমি বরং তোমার বউদিকে আঁকো।

—বউদিকে কতবার বলেছি। বউদি কিছুতেই রাজি হয় না। তুমি দেখো না, তুমি যদি রাজি করাতে পার!

বিশ্ব বলল, বউদি এদিকে এসো। মণিমালা তোমার ছবি আঁকতে চায়।

মণিমালা হাসিমুখে দু'দিকে মাথা নাড়লেন। তাঁর নরম হাসি মুখের মধ্যে এমন এক দৃঢ়তা আছে যে বোঝা যায়, তিনি রাজি হবেন না কিছুতেই।

মণিমালা বলল, দেখলে, দেখলে, বউদিটা বড্ড জেদি! তুমি দাঁড়াও, না, না, ওখানে না, পেছন দিক থেকে আলো আসছে। এই দিকে দেয়াল ঘেঁষে। বেশি নড়াচড়া করবে না, এখন সিগারেট খাওয়াও চলবে না। মুখটা স্ট্রেট করো, সোজাসুজি—

মণিমালা ড্রয়িং করতে লাগল। বিশ্ব এক একবার তাকাচ্ছেন সুধার দিকে, আর মণিমালা বকুনি দিচ্ছে, এই, এই, অন্য দিকে তাকাবে না।

অন্য দৃশ্য। বারান্দায় বিশ্বর পোর্ট্রেট আঁকছে মণিমালা, পাশের ঘরে কথা বলছে সুধা আর রমেন।

সুধা বললেন, বিজয়বাবুর স্ত্রী বলছিলেন, ওঁদের স্কুলে একজন টিচার দরকার। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি ওই স্কুলে পড়াব?

রমেনের সামনে একগাদা ফাইল। একটা ফাইল দেখতে দেখতে বললেন, তুমি স্কুলে পড়াবে? কেন?

সুধা বললেন, সারা দুপুর তো বাড়িতেই বসে থাকি। কোনও কাজ নেই। অরুন্ধতীও পড়ান ওই স্কুলে।

রমেন বললেন, তুমি চাকরি করবে? কেন, আমি তোমাকে হাতখরচ দিই না? কোনও কিছু কিনতে চাইলে...

সুধা বললেন, না, না, এটা ঠিক চাকরি নয়। একটা এন.জি.ও স্কুলটা চালায়। বস্তির ছেলে-মেয়েরা, খুব গরিবরা পড়ে। এই সব স্কুলের টিচারদের তো ঠিক মাস মাইনে দেওয়া হয় না, সামান্য কিছু কনভেয়ান্স,

তাই টিচার টেকে না।

ফাইল থেকে চোখ তুলে রমেন কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে।

তারপর বললেন, তুমি বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়াবে? ওরা সব এক একটা রোগের ডিপো। ওই অরুন্ধতী তোমায় কী বুঝিয়েছে জানি না। আমি ওসব এন.জি.ও টেন.জি.ও-দের ভাল চিনি। সব ধান্দাবাজ। মুখে বড় বড় কথা, আসলে ফরেন ডোনেশন আদায় করার চেষ্টা। তোমাকে ওরা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবে।

সুধা বললেন, আমার ওসব জানার দরকার নেই। স্কুল তো একটা চলে ঠিকই, আমি কয়েক ঘণ্টা পড়িয়ে আসব। পড়াতে আমার ভাল লাগে। বিয়ের আগে আমি তো পড়িয়েছি কিছু দিন। এখন কিছুই করি না, শুধু সংসার...

রমেন বলল, সুধা, আমাদের ফ্যামিলির মেয়েরা-বউরা একা একা বাইরে বেরোয় না। তোমার সময় কাটে না, তুমি আমার এই সব ফাইলপত্র দেখে সাহায্য করলেই পার। আমাকে একা একা খেটে মরতে হয়, কনস্ট্রাকশন বিজনেসে হিসেব-টিসেবের ব্যাপারে বাইরের কোনও লোককে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, গত মাসেই তো আমার অ্যাকাউন্ট্যান্টকে তাড়িয়ে দিলাম। বাস্টার্ড! ভেতরে ভেতরে আমার সব খবর চক্রবর্তীদের জানিয়ে দিত। এই ফাইলটা দেখবে, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুধা হেসে বললেন, আমি তো ওসব বুঝব না। অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলাম।

রমেন বলল, তোমাকে সাহায্য করব, এমন কিছু কঠিন অঙ্ক নয়। দ্যাখো, দীপুটা তো কিছুতেই আমার বিজনেসে এল না। কীসব নাটক-ফাটক করে বেড়াচ্ছে! আমার এক কাকাও ছিলেন ওই রকম।

সুধা বললেন, দীপু কিন্তু ভাল অ্যাক্টিং করে। এক সময় খুব নাম করবে।

রমেন মুখ বিকৃত করে বললেন, ধুৎ, ওসব লাইনে নাম করলেই বা কত পয়সা রোজগার করবে? শোনো, ওই যে অরুন্ধতী, ওর আগে একটা বিয়ে ছিল, তুমি জানো?

সুধা বললেন, না, জানি না তো!

রমেন বললেন, এখনও যা ধরনধারণ, বিজয়ের সঙ্গে বিয়েটা কত দিন টিকবে কে জানে! একা একা ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়ায়, দিল্লি, সিমলা তো প্রায়ই যায়। তুমি ওর সঙ্গে বেশি মিশো না। ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স!

সুধা বললেন, ঠিক আছে, বেশি মিশব না। স্কুলটাতে পড়াই না গো। খুব ইচ্ছে হয়েছে।

রমেন বললেন, না। ওসব চিন্তা মন থেকে তাড়াও!

আর একটি দৃশ্য : একটা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে দীপেন, তার হাতে একটা বই, সে নাটকের পার্ট মুখস্থ করছে। জানলা দিয়ে দেখছে বিশ্ব আর মণিমালা। বিশ্ব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মণিমালাকে চুপ করে থাকতে বলছেন। একটা ক্যামেরা বার করে চুপিচুপি ছবি তুললেন দীপেনের। ক্লিক হতেই দীপেন এদিকে তাকাল। হেসে উঠল মণিমালা।

পরের দৃশ্য : বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন কর্মচারীকে বকাবকি করছেন রমেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ক'টা বউ? আমি জানতে চাই, ক'টা বউ?

কর্মচারীটি বলল, বউ তো আমার একটাই। দুই ছেলেমেয়ের মা।

রমেন বললেন, যদি একটা বউই হয়, তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে তার অসুখ করলে সে বেঁচে থাকে কী করে? কয়েক মাস ধরেই তো দেখছি।

লোকটি বলল, আজ্ঞে, চিকিৎসা তো করাচ্ছি। সারছে না কিছুতেই।

—তুই কী চিকিৎসা করছিস কে জানে! বউয়ের অসুখের নাম করে সপ্তাহে দু' দিন কামাই, আমার কাজ নষ্ট, আমি কি দানছত্তর খুলে বসেছি? এর ওপর আবার হাজার টাকা অ্যাডভান্স চাইছিস?

—আজ্ঞে, এই দেখুন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান।

—ওসব আমি কিছু দেখতে চাই না। তোকে আর আসতে হবে না কাল থেকে, আমি অন্য লোক রেখেছি।

—স্যার, এই অবস্থায় আমাকে তাড়াবেন না। খুব বিপদে পড়ে যাব।

—তোকে রাখলে আমার আরও বেশি বিপদ। ক্লায়েন্টের কাছে কথা রাখতে পারছি না, মুখ দেখাতে পারছি না

—এরকম আর হবে না স্যার! এবার থেকে আমি ঠিক ঠিক আসব...হাতে একটা পয়সা নেই, আপনি টাকাটা না দিলে...

—অ্যাডভান্সের তো প্রশ্নই উঠছে না। তোকে আমি আর রাখব না। তুই অন্য জায়গা দ্যাখ।

—এবারের মত দয়া করুন।

—দয়া? এই, এই, আমার পা ছুঁবি না। তোদের ছোঁয়া লাগলেও আমার ঘেন্না হয়।

ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সুধা। তাঁর চোখে জল। গেটের বাইরে গাড়িতে বসে আছেন বিশ্ব।

আর একটি দৃশ্য : কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্ব। ভেতরে নাটক দেখতে ঢুকছে অনেক মানুষ।

একটা ট্যাক্সি থেকে নামলেন সুধা, সঙ্গে মণিমালা।

বিশ্ব এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রমেনদা এলেন না?

সুধা বললেন, না, কতবার বললাম। আজ দীপুর নতুন নাটক।

মণিমালা বলল, আমাদেরও আসতে দিচ্ছিল না। বউদিকে বলছিল, কে তোমাদের নিয়ে যাবে! আমরা যেন নিজেরা ট্রেনে করে আসতে পারি না।

বিশ্ব বলল, চলো, চলো, এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে।

ওরা তিনজন ঢুকে এলো হলের মধ্যে। একেবারে সামনের সারিতে সিট। প্রথমে বসল মণিমালা, তারপর সুধা, তারপর বিশ্ব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মণিমালা বলে উঠল, আমি বিশ্বদার পাশে বসব।

সুধা উঠে দাঁড়ালেন, মণিমালা সরে এলো বিশ্বের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠে নাটক শুরু হল। প্রথম দৃশ্যেই দীপেন।

আর একটি দৃশ্য। সমুদ্র তীর। এ আন্দামানের সমুদ্র নয়, প্রশস্ত বেলাভূমি, বড় বড় ঢেউ।

প্রথমে দেখা গেল একসঙ্গে রমেন, সুধা, মণিমালা আর বিশ্বকে।

তারপর রমেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে, হাফ-প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, মাথায় শোলার টুপি।

সুধা আর বিশ্ব এগিয়ে গেলেন মাঝখানে মণিমালাকে রেখে। মণিমালা ধরে আছে বিশ্বর হাত। বিশ্বর গলায় ঝুলছে ক্যামেরা।

তিনজনে হাঁটলেন খানিকক্ষণ। তারপর মণিমালা থেমে গেল কয়েকটা ঝিনুক কুড়োবার জন্য।

বিশ্ব আর সুধা থামলেন না।

সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ে দুলছে কয়েকটা নৌকো। ওড়াউড়ি করছে কয়েকটি সিগাল পাখি।

ক্রমে সেই বেলাভূমিতে অন্য লোকজন আর দেখা গেল না। শুধু হাঁটছেন সুধা আর বিশ্ব। কেউ কোনও কথা বলছেন না, শুধু মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন পরস্পরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে মিলিয়ে গেল অনেক দূরে। যেন দু'টি ছোট্ট বিন্দু।

পাথরের বেঞ্চের ওপর বসে আছেন প্রৌঢ় বিশ্বরঞ্জন। তাঁর চোখ বোজা। এখনও শুনতে পাচ্ছেন বহু বছর আগেকার সেই সমুদ্রের গর্জন।

॥ ৮ ॥

একটা ফাঁকা জায়গায় ঘুড়ি ওড়াবার চেষ্টা করছে সাহানা। তাকে ধরাই দিচ্ছে ভেলু। সাহানাকে দেখার জন্য একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। সাহানা যতই বাচ্চা বয়েসে ঘুড়ি ওড়াবার কথা বলুন, এখন সে-সব ভুলে গেছে, একদমই পারছে না। তবে আনন্দে-উৎসাহে লাফালাফি করছে খুব।

ভেলু বলল, আমাকে দিন না, আমি সরসর করে আকাশে উড়িয়ে দেব।

সাহানা বলল, না, তোকে কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক পারব।

ভেলু মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগল, আপনি পারবেল লা, পারবেল লা—

সাহানা বলল, চুপ কর! পারবেন না, পারবেন না!

মধুজা আর রিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে। তারা হাসছে।

সায়ন একটু পরে এসে একটুক্ষণ সাহানার ঘুড়ি ওড়ানো দেখল।

তারপর মধুজার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, তুমি চলো আমার সঙ্গে। অমিতের ফ্লাইট আসবে আর আধঘন্টার মধ্যেই।

মধুজা রিনিকে বলল, আমরা ঘুরে আসছি।

ওদের গাড়ি চলে গেল এয়ারপোর্টের দিকে।

লজের ডাইনিং টেবিলে যে দুটি লোক সাহানাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে এসেছিল, তারাও দাঁড়িয়েছিল এই ভিড়ের মধ্যে।

তাদের একজন এগিয়ে এসে বলল, মে আই হেল্প ইউ? আমি খুব ভাল ঘুড়ি ওড়াতে পারি। আমি ওপরে তুলে দিচ্ছি, তারপর আপনি ইজিলি...

সাহানা বলল, ইউ আর ওয়েলকাম। ইউ টেক ইট। ইউ ফ্লাই।

ঘুড়ির সুতো সেই ব্যক্তিটির হাতে তুলে দিয়ে সে বলল, চল রে ভেলু, হোটেলে যাই।

ঘুড়ি, সুতো-টুতো সবই সেই লোকটিকে দিয়ে, সাহানা রিনির সঙ্গে হেঁটে চললো লজের দিকে।

ভেতরে কাউন্টারের সামনে দু' তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের পাশ দিয়ে সাহানা আর রিনি উঠে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে, ম্যানেজার ডেকে বলল, ম্যাডাম, ম্যাডাম, একটা কথা শুনবেন?

সাহানা আর রিনি থেমে গেল।

ম্যানেজার বললেন, এখানকার বেঙ্গলি ক্লাবে আজ সন্ধেবেলা ফাংশান আছে। আপনারা দেখতে যাবেন? তা হলে কার্ড রেখে দেব।

রিনি জিজ্ঞেস করল, কী ফাংশান আছে?

ম্যানেজার বললেন, গান আছে, নাচ, নাটক, কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আসছে।

সাহানা বলল, কলকাতার আর্টিস্টদের গান-টান আর আমরা এখানে এসে কী শুনব!

ভেলু বলল, লাটক! লাটক! আমি দেখব, ম্যানেজারবাবু, আমায় ছুটি দেবেল তো!

ম্যানেজার ধমক দিয়ে বললেন, আবার ম্যানেজার বলছিস! তোকে বলেছি না শুধু বাবু বলবি?

সাহানা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, এই ছেলেটা ন বলতে পারে না কেন? আর সবই ঠিক বলে!

ম্যানেজার বললেন, একবার যাকে লয়ে ধরে, ভূতের মতন, সে আর ন খুঁজে পায় না। ন-এর গল্প আছে, জানেন তো। শুনবেন?

কেউ একজন বলল, বলুন না।

ম্যানেজার বললেন, নস্যিকে অনেকে নইস্য বলে জানেন তো! এক পণ্ডিতমশাই খুব নস্যি নিতেন। তিনি আবার ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, বালকগল, লইস্য লইয়ো লা, কক্ষলো লইস্য লইয়ো লা। লইস্য লইলে ল-কে (মানে ন-কে) ল বলিতে পারিবে না। সবই ল হইয়া যাইবে। যদি ভাবো, আমিও তো লইস্য লই, তবু আমি ঠিক ঠিক ল-কে ল বলি কী করিয়া? তবে আমি বলিব, ইহা আমার অভ্যাসের গুল!

কয়েকজন হেসে উঠল।

সাহানা বলল, আহা, ও ছেলেটা তো নস্য নেয় না।

ম্যানেজার বললেন, ওর বাবা নিত নিশ্চয়ই। রক্তে ঢুকে গেছে।

ভেলু বলল, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন। বাবার কথা আমার মলেও

লাই।

সাহানা বলল, ভেলু তুই আমাদের সঙ্গে ওপরে আয়।

ভেলু ম্যানেজারের চোখের দিকে তাকাতে তিনি বললেন, ঠিক আছে, যা। একটু পরে খাবার জল সব ফুটিয়ে ফেলবি, নুন-গোলমরিচ সব টেবিলে আছে কি না দেখবি...

কলকাতার ফ্লাইট নেমেছে একটু আগে। একটি শুধু হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলো অমিত। সায়নের চেয়ে সে একটু বেশি লম্বা, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা, চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে।

হাত বাড়িয়ে সে সায়নের হাত ধরে ঝাঁকাল, তারপর মধুজাকে জিজ্ঞেস করল, কী, এখনও রাগ করে আছ?

মধুজা বলল, শেষ পর্যন্ত তোমার আসার সময় হল তাহলে?

অমিত বলল, কী করব বলো! হঠাৎ আমাদের এম ডি এসে গেলেন বাঙ্গালোর থেকে। জানো তো, আমাকে কলকাতা থেকে ট্রান্সফার করতে চাইছে। অতি কষ্টে রেজিস্ট করছি। এই সময় যদি না থাকতাম, তা হলে আর দেখতে হত না। অথচ, সায়ন আসছে বলে, আমিই তো আমাদের এখানকার সব প্ল্যানটা করেছিলাম।

সায়ন বলল, যাকগে, শেষ পর্যন্ত তো এসে পড়েছিস। আমরা জমিয়ে আড্ডা দেব।

মধুজা বলল, কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?

অমিত বলল, কেন, থাকার জায়গার অভাব আছে নাকি?

মধুজা বলল, আমাদের লজে রিনির জন্য অতিকষ্টে একটা ঘর জোগাড় করেছি। আর একটাও ঘর খালি নেই, দু' একদিনের মধ্যে খালিও হবে না।

সায়ন বলল, ও আমার ঘরে থাকতে পারে। দুটো বেড আছে।

অমিত হেসে বলল, তুই একটা ইডিয়েট! আন্দামানে বেড়াতে এসে আমি বউকে অন্য হোটেলে রেখে একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে রাত কাটাব? তা হলে ও আমাকে আস্ত রাখবে?

সায়ন বলল, কিন্তু ওদের লজে যদি জায়গা না থাকে?

অমিত বলল, এর একটা খুব সিম্পল সলিউশন আছে। ওই লজে মধুজা আর সাহানা থাকে এক ঘরে। আর রিনি আর একটা ঘরে। এখন সাহানা রিনির ঘরে চলে যাক। আমি তোমার ঘরে, তোমার সঙ্গে থাকব।

সায়ন উৎসাহিত হয়ে বলল, সেটা তো হতেই পারে।

মধুজা বলল, না, অত সহজ নয়। জানো তো, সাহানা কী রকম মুডি মেয়ে। রিনি একতলায় থাকে, সাহানা একতলা একদম পছন্দ করে না। বাইরের সব কথাবার্তা শোনা যায়। জানি না, ও রাজি হবে কি না!

সায়ন বলল, এটুকু সাহানাকে মানিয়ে নিতেই হবে।

তারপরই সে হেসে বলল, রিনি আর সাহানা এক ঘরে, ওরা আবার ঝগড়া করবে না তো!

অমিত এবার একটু উগ্র গলায় বলল, আচ্ছা, রিনি এটা কী করল বল্ তো? ওর বাবা খুব আপসেট হয়ে গেছেন। বাড়িতে এরকম মিথ্যে কথা বলে আসা...

সায়ন বলল, আন্দামানে আসবে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবে, এ কথা তো বলেই এসেছে।

—তুই এখানে থাকবি, সে কথা বলেছে?

—তা বলতে সাহস পায়নি, তবে এটাকে ঠিক মিথ্যে কথা বলা যায় না। অন্য বন্ধুদের নাম বলেছে, শুধু একজনের নাম চেপে গেছে।

—বাজে কথা বলিস না সায়ন। তোর থাকা আর না-থাকায় অনেক তফাত হয় না? তোর সঙ্গে রিনির কী সম্পর্ক, তা কি ওর বাড়ির লোক জানে না? রিনির দাদা জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করে তোর নাম দেখেছে!

—সো হোয়াট? আজকাল অনেক জায়গাতেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বেড়াতে যায়।

—বেশ তো! সে কথা রিনি সোজাসুজি জানিয়ে আসতে ভয় পেয়েছে কেন? ইউরোপ-আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা যায়, তারা তো কেউ বাবা মায়ের কাছে থাকে না। তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যা খুশি করে। রিনির দাদা আমাকে বলল, ওদের বাবা খুব হার্ট হয়েছেন।

মধুজা বলল, রিনির বাবা তো সায়নকে অপছন্দ করেন না। অনেক সময় ডেকে গল্প করেন।

অমিত বলল, সে কথা হচ্ছে না। বাবা-মাকে না বলে আসা কিংবা মিথ্যে কথা বলার মধ্যে ওঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। যত দিন বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকব, তত দিন তাঁদের সম্মানও করা উচিত।

সায়ন বলল, অমিত তুই-ও তো দেখছিস রীতিমত মরালিস্ট! ঠিক আছে, রিনি যদি চায়, তা হলে কালকেই ওকে প্লেনের টিকিট কেটে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অমিত বলল, সে কথা হচ্ছে না। আমার মতে, রিনির আজ-কালের মধ্যেই বাড়িতে ফোন করে সব কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

মধুজা বলল, আমিও রিনির মাকে বলে দিতে পারি, রিনি সায়নের সঙ্গে এক হোটেলে থাকে না। আমাদের সঙ্গে অন্য হোটেলে থাকে! এর মধ্যে তো আর ইম্‌-মরাল কিছু নেই। ওর মা আমাকে ঠিক বিশ্বাস করবেন।

অমিত বলল, সত্যি কথার কোনও মার নেই। বাবা-মায়েরা যখন ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে সত্যি কথা শোনেন, তখন তাঁরাও অনেক কিছু মেনে নেন।

একটু পরে সায়ন আবার বলল, শোন অমিত, তুই তো থাকবি তোর বউয়ের সঙ্গে অন্য লজে। কিন্তু সন্ধের পর আড্ডাটা হবে আমার ঘরে।

মধুজা বলল, আহা, সায়নের ঘরে একটা খাট খালি পড়ে থাকে সারা রাত। ও বেচারা ছটফট করে।

সায়ন বলল, আমি একবার এ খাটে, আর একবার অন্য খাটে শুই।

কথা বলতে বলতে গাড়িটা এসে পৌঁছে গেল 'গীতাঞ্জলি' লজের সামনে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িটার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন বিশ্ব। সায়নের সঙ্গে চোখাচোখি হতে শুধু পরিচিতির হাসি দিয়ে, কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলেন তিনি।

সায়ন মধুজাকে বলল, তোমাদের বলেছিলাম না, ভদ্রলোকের নাম শুনে আর চেহারা দেখে আমার বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। সত্যিই চেনাশুনো বেরিয়ে গেছে। উনি আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন এক সময়। আমাদের কিছু একটা আত্মীয়ও হন।

বিশ্ব হেঁটে যাচ্ছেন বড় রাস্তার দিকে।

॥ ৯ ॥

একটা আশ্রমের লোহার গেট খুলে বেরিয়ে এলেন আমাদের পূর্বপরিচিত গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। তাঁর হাতে ছাতা। বিশ্বকে প্রায় সামনাসামনি দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, নমস্কার, নমস্কার বিশ্ববাবু, ভাল আছেন?

বিশ্বও নমস্কার জানিয়ে বললেন, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিলাম।

সন্ন্যাসী বেশ বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে? কী সৌভাগ্য আমার!

বিশ্ব বললেন, দীক্ষাটিক্ষা নেবার উদ্দেশ্য অবশ্য আমার নেই।

সন্ন্যাসী বললেন, আপনাকে আমি দীক্ষা দেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নই। আপনি হঠাৎ দীক্ষা নিতে চাইলেও আমি দিতে রাজি হব কি না বলা যায় না।

এবারে বিশ্ব অবাক হয়ে বললেন, সে কী, আমি চাইলেও আপনি রাজি হবেন না কেন?

সন্ন্যাসী বললেন, দীক্ষা তো কোনও হুজুগের ব্যাপার নয়। কেউ হুট করে এসে দীক্ষা নেব, দীক্ষা নেব, বলতে লাগল, আমরা অমনি তাকে মন্ত্র দিয়ে দিলাম, না, না, না, ওভাবে হয় না। আগে দেখে নিতে চাই, তার মন শুদ্ধ হয়েছে কিনা। নিছক যুক্তিবাদ কিংবা স্বার্থচিন্তা ছেড়ে তার মন ভক্তিমার্গের দিকে ঝুঁকেছে কিনা। তারপর দীক্ষার প্রশ্ন আসে। নিছক সংখ্যা বাড়িয়ে চলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বিশ্ব বললেন, স্বার্থচিন্তা! আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা খুব ধর্ম ধর্ম করে, অনেক কিছু মানে, পুজো-আচ্চা সব করে, অথচ তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ভণ্ড, মানুষকে ঠকায়।

সন্ন্যাসী বললেন, তা আমি অস্বীকার করছি না। মানুষ তো কত রকম হয়। কিছু কিছু নাস্তিককে আমি শ্রদ্ধা করি, স্বামী বিবেকানন্দও করতেন।

কিন্তু তা বলে সব নাস্তিকই কি, মানে, হিটলার-মুসোলিনিও তো নাস্তিক ছিল, তাই না? যাক গে ও কথা। আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চান, তা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

বিশ্ব বললেন, আপনার কাছ থেকে আমি দু' একটা কথা জানতে চাই। চলুন না কোথাও গিয়ে বসি।

কাছাকাছি একটা বেঞ্চ পেয়ে বসে গেলেন দু'জনে।

সন্ন্যাসী বললেন, মাত্র কয়েক দিন আগেও দেখেছি, আপনি কোথাও বসলেই সিগারেট ধরাতেন, এর মধ্যে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন?

বিশ্ব বললেন, হ্যাঁ! আর ছুঁই না।

সন্ন্যাসী বললেন, তাস খেলাও ছেড়েছেন শুনলাম। মাছ-মাংসও ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

বিশ্ব বললেন, মাংস ছেড়ে দিয়েছি। মাছটা এখনও পারিনি। দেখা যাক, আর দু' একদিনের মধ্যে...

—আপনাকে হঠাৎ এমন ছাড়ার নেশায় পেয়ে বসল কেন?

—এটার উত্তর পরে দিচ্ছি। তার আগে, বলুন তো, আপনাদের কাছে যারা দীক্ষা নিতে আসে, তারা সবাই তো বেশি বয়েসি, তাই না?

—কিছু কিছু অল্প বয়েসিও আসে। তারা সাধারণত আমাদের সেবামূলক কাজে যোগ দিতে চায়। তবে, আপনি ঠিক বলেছেন, বয়েস বেশি হলেই মানুষ এ দিকে ঝোঁকে।

—কেন? কোনও কিছুর ভয়ে, না কোনও কিছু পাবার আশায়?

—দুটোই ঠিক বলতে পারেন। বয়েস হয়ে গেলে মানুষের শরীরের জোর কমে যায়, মনের জোরও কমে আসে। অনেককে আবার নিঃসঙ্গতাও পেয়ে বসে। তখন পাপ-পুণ্যের কথা মনে আসে। যারা পরজন্ম কিংবা স্বর্গ-নরক মানে, তারাও ভাবে যে ধর্মের আশ্রয় নিলে, ঈশ্বরের দয়া চাইলে নরকের বদলে স্বর্গে ভাল জায়গা পাবে। পরজন্মে অনেক সার্থক হবে।

—আনন্দজি, আপনি স্বর্গ-নরক কিংবা পরজন্ম মানেন?

—না। দাদা, ওসব নিয়ে আমার মাথা না ঘামালেও চলে।

—আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন নিশ্চয়ই?

—আপনি নিশ্চয়ই বলে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে আমার শুধু মাথা নাড়া চাইছেন?

—আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন যখন...

—এ প্রশ্নটা কারুকে সরাসরি না করাই ভাল। কারণ এর একেবারে সরাসরি উত্তর হয় না। তবে, আপনাকে একটা কথা জানাই, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা ঈশ্বর মানেন না।

—বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আমি কিছুটা পড়াশুনো করেছি। ওদের আবার নির্বাণ, মহানির্বাণ নিয়ে খুব শক্ত ব্যাপার আছে। যাক গে, এবার আমি নিজের কথা বলি।

এই পর্যন্ত বলে বিশ্ব চুপ করে গেলেন।

সন্ন্যাসী কয়েক পলক তাঁর দিকে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী হল বলুন!

বিশ্ব মুখ নিচু করে বললেন, এখন সঙ্কোচ হচ্ছে। নিজের কথা কখনও কারুকে বলতে যাইনি, হঠাৎ কেন আপনার কথা মনে হল...মানে, শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে।

—মানুষের কথা শুনলে সময় নষ্ট হয় না। সব মানুষই তো এক একটা গল্প। আমি গল্প শুনতে খুব ভালবাসি। ঠিক আছে, আপনার কথাটা আগে বলুন, তারপর আমি আমার কথা বলব।

—দেখুন আনন্দজি, আমার সেরকম কোনও গল্প নেই। আমার শুধু কয়েকটা প্রশ্ন, তা নিজের কাছেই বারবার উত্থাপন করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। যখনই একা থাকি, তখনই মাথায় এই একই চিন্তা। তাই আর একজনকে....আমারও তো বেশ বয়েস হয়েছে, এখন ছেষট্টি চলছে, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছি, এখন হঠাৎ মৃত্যু হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

—কী মৃত্যুর কথা বলছেন? আপনাকে দেখলে আপনার বয়েস বোঝাই যায় না। এখনও আপনার কাজ করার অনেক ক্ষমতা আছে।

—মানুষ মৃত্যুর কথা বললেই অন্য সবাই বলে, না, না, এখনই ওসব ভাবছ কেন, তোমার অসুখ বিসুখ কিছুই হয়নি। যদিও কার কখন মৃত্যু আসবে, তা কেউ বলতে পারে না। আমার এই বয়েসে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলে তা মোটেই অস্বাভাবিক বলা যাবে না। আমি মৃত্যু নিয়ে মোটেই চিন্তিত নই। তবে, তৈরি থাকা ভাল। আসল ব্যাপারটা তা নয়। ধরা যাক, আমার আরও ছ' মাস কিংবা এক বছর আয়ু আছে। এই সময়টা নিয়ে আমি কী করব?

—কী করবেন মানে? এখন যা করছেন।

—বাঁচতে গেলে তো একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে হয়? আমি ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকতে পারব না। আমার মনের গঠনই সেরকম নয়। ছোটবেলা থেকে আমি বিজ্ঞানচর্চা করেছি। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে পারি না।

—অনেক বিজ্ঞানীও তো ঈশ্বর মানেন!

—তখন তাঁরা বিজ্ঞানী থাকেন না। বিশ্বাসী হয়ে যান। মানুষের এরকম দু' রকম সত্তা তো থাকেই। প্রমাণিত সত্য ছাড়া বিজ্ঞান অন্য কিছু মানতে পারে না। শব পরীক্ষাতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়নি। অনেকে তবু মানে, তারা মানুক, কিন্তু আমি...

—বিজ্ঞান তো সব কিছু এখনও প্রমাণ করতে পারেনি। এখনও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে।

—তা ঠিক, বিজ্ঞানের বাইরেও এখনও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। বিজ্ঞান যতটুকু প্রমাণ করেছে, আমি ঠিক ততটাই মানি। যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ মানি। ডারউইন সাহেবের এভোলিউশন থিয়োরি, মানে বিবর্তনবাদের পরে বুঝে গেছি যে মানুষ বা অন্য প্রাণীকে ভগবান সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই! যা কিছু বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারেনি, তা মেনে নেবারও সময় আসেনি। তা হলে, আমার সামনে ধর্ম নেই, ঈশ্বর নেই, আমি সময়টা কী নিয়ে কাটাব?

—তা হলে পড়াশুনো করতে পারেন। ইতিহাস, দর্শন...

—এখন বই পড়তেও একঘেয়ে লাগে? জ্ঞান দিয়ে আর কী হবে? কীসের কাজে লাগাব?

—আপনার যা জীবনিশক্তি আছে, তা মানুষের কাজে লাগাতে পারেন। কত মানুষ এখনও অসহায়।

—মানুষের সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছি। কারুর প্রতি আমার কোনও টান নেই। শুধু শুধু লোকদেখানো চ্যারিটি, ও আমার দ্বারা হবে না। আমি জানতাম, আপনার কাছ থেকেও কোনও উত্তর পাওয়া যাবে না। তবু বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমার এই জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে ব্যবধান, সেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

—বিশ্ববাবু, আপনি কখনও বিয়ে কিংবা সংসারটংসার করেননি? আপনার বাবা-মা কোথায়, এই সব বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করছে!

—সন্ন্যাসীঠাকুর, আপনি আপনার অতীত বিষয়ে কিছু বলবেন না, আমিই বা কেন বলতে যাব? ওসব আমি মুছে ফেলেছি।

সন্ন্যাসী হা-হা করে হেসে বললেন, তা হলে আমি হেরে গেলাম!

বিশ্ব অনেকটা আপন মনেই বলে চললেন, এখন আমার মনে আর একটা ভাবনা এসেছে। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে না মরে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন কী হবে? কিছু মানুষ আমাকে দয়া দেখাবে, হাসপাতালে দেবে, সেবা করবে...মানুষের সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখিনি, তবু মানুষের দয়া নিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে? ছিঃ! টাকাপয়সার যা সঞ্চয় ছিল, তাও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে

—সেই জন্যই তো বলেছি। এখনও আপনার যথেষ্ট কর্মক্ষমতা আছে। ইচ্ছে করলে রোজগারও করতে পারেন। কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে আর এসব কথা মনে আসবে না।

—নাঃ, আমি আর কোনও কাজটাজ করতে চাই না। সে সবও শেষ করে ফেলেছি। তাই ঠিক করেছি...

—এবার কি আত্মহত্যার কথা বলবেন নাকি? তা হলে আমি কানে আঙুল দেব! ও কথা শুনতেও চাই না।

—নাঃ, আত্মহত্যা নয়। বলতে পারেন, শেষ অভিযান। তবে প্রকৃতির হাতে, যাকে অনেকে নিয়তিও বলে, তার ওপর আমি নিজেকে ছেড়ে দেব না। শেষ দৃশ্যটা আমি নিজেই ঠিক করব! সমুদ্র থেকেই তো মানুষের জন্ম, আবার সমুদ্রেই ফিরে যাব! শিগগিরিই ভেসে পড়ব একদিন।

—ও, সেই জন্যই ওই নৌকোটা বানিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কত দূরে যাবেন ওই নৌকোয়?

—যত দূর যাওয়া যায়। দেখি, কোনও অজানা দেশ খুঁজে পাওয়া যায় কি না!

—এই বঙ্গোপসাগরে কি আর কোনও অজানা দেশ আছে? ওই নৌকো নিয়ে বেশি দূরে যাবেনই বা কী করে? আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবেই।

—নাঃ, ফিরে আর আসব না। যত দিন পারি ভেসে থাকব। ফিরে আসতে যাতে না হয়, সেইজন্য মনের জোর সংগ্রহ করছি। পুরোপুরি তৈরি হলেই...

—এবার আপনাকে একটা কথা বলব, রাগ করবেন না তো?

—না, রাগ করব কেন, বলুন, বলুন!

—আপনি যে ঈশ্বরকে মানেন না, সেই ঈশ্বরের কাছেই আপনার মনের শান্তির জন্য আমি প্রার্থনা করব।

॥ ১০ ॥

লজের দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বিশ্ব ডাকলেন, ভেলু, ভেলু।

যাই আজ্ঞে, বলে, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ভেলু। বিশ্বর ঘরে ঢোকার পর তিনি বললেন, বোস। দরজাটা ভেজিয়ে দে।

ভেলু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল।

বিশ্ব বললেন, ওখানে নয়, ওই চেয়ারে উঠে বোস।

ভেলু বলল, লা। আমাগো চেয়ারে বসতে লাই।

বিশ্ব ধমক দিয়ে বলল, বোস বলছি!

ভেলু উঠে আড়ষ্ট হয়ে বসল একটা চেয়ারে।

বিশ্ব বললেন, আজ তো স্পেশাল হরিণের মাংস রান্না হয়েছে। তুই খেয়েছিস?

ভেলু বলল, লা। আমাগো দেয় লা। আমি, রতল, চিলিবাস, আমরা মাংস পাই লা।

—আমি তো এখন মাংস খাই না। আমার ভাগেরটা তোকে দিতে পারে না?

—লা গো বাবু। লিয়ম লাই। লষ্ট হইলেও আমাগো দেবে লা।

—নিয়ম নাই? এ কী অদ্ভুত নিয়ম।

—আমাগো অভ্যাস খারাপ হইয়ে যাবে। আমাগো জইল্য শুধু ভাত ডাইল আর তরকারির ঝোল।

বিশ্ব বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা চকোলেটের বার তুলে ভেলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে, তুই এটা খা!

ভেলু দু' হাত পেতে সেটা নিয়ে বলল, এটা আমারে দিচ্ছ কেল?

বিশ্ব বললেন, এটা তোকে দিচ্ছি, তার কারণ, তুই আমার জাহাজটা তৈরির সময় একটু একটু সাহায্য করেছিস, সেই জন্য।

ভেলু হে হে করে হেসে বলল, আমি তো কিছু করি লাই!

বিশ্ব বললেন, একবার-দু' বার তো হাত লাগিয়েছিস। নে এটা এখনই খা।

ভেলু চকলেটে একটা কামড় বসাল।

বিশ্ব আবার ড্রয়ারটা খুলতে খুলতে বললেন, আমি এবার এখান থেকে চলে যাব রে ভেলু! আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না!

ভেলু বলল, চলে যাবে? কোথায়?

বিশ্ব বললেন, তা জানি না। এখানে তো অনেক দিন হল।

ড্রয়ার থেকে এবার তিনি বার করলেন বেশ বড়, গোল একটা পকেট ঘড়ি। সেটাও ভেলুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নে, এটা ধর।

ভেলু প্যান্টে এক হাত মুছে ঘড়িটা নিয়ে বলল, এমা, কী সোন্দর! সোলার?

বিশ্ব ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললি? সোলার? সোলার না রে, সোনার। সোলা আর সোনায় অনেক তফাত। এবার ভাল করে উচ্চারণ করতে শেখ। বল সোনা!

ভেলু বলল, সোলা! এটা দিয়ে কী হবে?

—এটা আমি তোকে দিলাম।

—আমারে? ক্যানো?

—আমার ইচ্ছে হল। এটা এখনও চালু আছে। তুই ঘড়ি দেখতে জানিস তো?

—জালি। কিন্তু এটা আমি লিব লা।

—কেন নিবি না?

—লিলে লোকে আমারে চোর বলবে। যখলি কারুর কিছু হারায় তখলই সগ্গলে আমাগো চোর ভাবে। একবার আমারে থালায় লিয়ে গিয়েছিল।

—থালায়, মানে, থানায়? ওঃ, তোর সব কথা বোঝে কার সাধ্য! শোন্, আমি একটা কার্ডে লিখে দিচ্ছি, সেই কার্ডটা সঙ্গে রাখবি সব সময়। তাহলে আর তোকে কেউ চোর বলবে না।

—তাইলে কেউ আমারে মারবে। জোর করে কেড়ে লেবে।

—যদি কেউ কেড়ে নেয়, তাহলে তখন তুই নিজেই থানায় যাবি। এই কার্ডটা দেখাবি। পুলিশই এটা খুঁজে দেবে।

ভেলু ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, আমার এসব ঝঞ্ঝাটে দরকার লাই। আমি গরিব, বাপ-মা লাই, কেউ লাই, দুই মুঠা ভাত পাইলেই যথেষ্ট। আমার আর কিছুই দরকার লাই।

—তুই ঘড়িটা সত্যিই নিবি না?

—লা।

—কেউ অন্য কিছু দিতে চাইলেও নিবি না? কী বলবি?

—চাই লা!

—গুড! কারুর কাছ থেকে কিছু না নেওয়া ভাল অভ্যেস। বলবি, চাই না, চাই না, চাই না! কী বলবি?

—চাই লা।

—না, চাই লা বললে হবে না। ঠিক করে বলতে হবে। বল, চাই না, চাই না, চাই না!

শেষের দিকে বিশ্ব প্রায় গর্জন করে উঠলেন। ভেলু আবার চাই লা, বলতেই বিশ্ব তার চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড জোরে বললেন, বল, চাই না, চাই না, চাই না।

আরও দু' একবার ভুল করার পর ভেলু একটা মাথা ভাঙা মূর্ধ্য ন-এর মতন ক্ষীণ ভাবে উচ্চারণ করল, চাই-ই না।

বিশ্ব বললেন, এই তো অনেকটা হয়েছে। আবার বল্! বল্!

আরও কয়েকবার চেষ্টার পর ভেলু স্পষ্টই বলতে পারল, চাই না!

হাসি ফুটে উঠল বিশ্বর মুখে। তিনি বললেন, একবার যদি মানুষকে চাই না বলতে পারিস, তবে সবই বলতে পারবি। বল, খাই না, যাই না...

ভেলু বলল, খাই না, যাই না।

বিশ্ব বলল, বাঃ! আর তোর সম্পর্কে আমার চিন্তা রইল না। এবার যা, ম্যানেজারবাবু আবার ডাকাডাকি করবে।

ভেলু যেতে গিয়েও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে বলল, বাবু, সত্যি চলে যাবে?

বিশ্ব তার কাছে এসে চুলে হাত ঢুকিয়ে আদর করে বলল, হ্যাঁ রে, যেতে তো হবেই। এটা হোটেল, এখানে কি কেউ চিরদিন থাকে?

ভেলু চলে যাবার পর বিশ্ব ঘরের মাঝখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘড়িটা তুলে নিলেন হাতে।

সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আপনমনে বললেন, আর এটা রেখে কী হবে? আমার আর সময় দেখার দরকার নেই।

টপ করে জানলা দিয়ে তিনি ঘড়িটা ফেলে দিলেন বাইরে।

॥ ১১ ॥

একটা গ্লাস বটম বোটে এসেছে ওরা পাঁচজন। আর চালকের নাম গোবিন্দন্। সায়ন আসতে পারেনি, তাকে মায়া বন্দর যেতে হয়েছে।

আকাশ এমনই পরিষ্কার যে রোদের বেশ ঝাঁঝ আছে, অন্য দিনের তুলনায় গরমই লাগছে। কোরাল রিফ দেখার এটা একটা আদর্শ দিন। কয়েকটা স্টিমার আর অনেকগুলি নৌকোয় ভর্তি হয়ে এসেছে দলে দলে টুরিস্ট। এঁদের মধ্যে বিদেশির সংখ্যাও যথেষ্ট। কেন যেন, সুইডেন থেকে অনেকেই আসে এই সুদূর আন্দামান দ্বীপে। অথচ সবাই জানে, সুইডেনেও প্রচুর দ্বীপ আছে। শুধু স্টকহল্‌ম শহরের কাছাকাছিই দ্বীপের সংখ্যা, ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় চব্বিশ হাজার।

টুরিস্টদের বোটের জটলা যেখানে, তার চেয়ে অনেক দূর চলে এসেছে গোবিন্দন্-এর বোট, জহির ইকবালের নির্দেশে। এখানেও একটা জনশূন্য, জঙ্গলময় দ্বীপ রয়েছে। তবে আগের দিনেরটা নয়, অন্য।

প্রবালের ঐশ্বর্য-দর্শন সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছে মধুজা। সে দক্ষ সাঁতারু। সে বারবার ডুব দিচ্ছে, চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। অমিত তত ভাল সাঁতার জানে না, তাই তাকে হাত ধরে ডুবজলে নিয়ে যাচ্ছে গোবিন্দন্। রিনি যদিও সুইমিং কস্টিউম পরে আছে, তবু সে একবার গোবিন্দনের হাত ধরে ডুব দেবার পর আর যেতে চায় না। তার ভাল লেগেছে খুবই। ভয়ও লেগেছে। আর সাহানা শাড়ি পরেই এসেছে, জলে একেবারেই নামবে না ঠিক করে। একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বসে আছেন বিশ্ব।

মধুজা একবার কাছে এসে বলল, সাহানা, তুই কী মিস করলি, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

সাহানা বলল, এই তো তলার কাঁচ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। কত রঙিন মাছ ঘুরছে।

মধুজা বলল, ও তো কিছুই না। কতটা গভীরে নামা যায় জানিস? আর কী অপূর্ব সুন্দর রঙ। আর কত রকম স্ট্রাকচার। কোথাও রাজপ্রাসাদ, কোথাও দুর্গ, কোথাও মন্দিরের মতন, একটা জায়গায় তো দেখলাম, একদম ঠিক একটা গির্জা, তলার দিকে অনেক বড় বড় গাছ, গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। আয়, আয় সাহানা, তোর কোনও ভয় নেই।

সাহানা বলল, না ভাই, কোনও দিন জলে নামিনি। মা বলে, আমার নাকি জলে ফাঁড়া আছে।

মধুজা বলল, ধ্যাৎ, ওসব বাজে কথা। ডিসকভারি চ্যানেলে যা দেখায়, সেটা হুবহু আমরা এখানে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। সত্যি সত্যি নিজে কখনও এটা দেখব ভাবিনি। এই রিনি, তুই চল, তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

রিনি বলল, না, আমার একবারই যথেষ্ট।

মধুজা বলল, আমি কিন্তু তা বলে এক্ষুনি উঠছি না। আরও অনেকক্ষণ দেখব।

সে আবার ডুব দিল জলে।

রিনি সাহানাকে বলল, ওই দিন অত সাহস দেখিয়ে ঢুকে গেলি জঙ্গলে, আজ একবারও জলে নামতে সাহস হচ্ছে না?

সাহানা বলল, কেন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিলাম, বুঝতে পারিসনি বোকা মেয়ে?

সে চোখের একটা ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ বোঝাতে চাইল, তার খুব বাথরুম পেয়ে গিয়েছিল।

রিনি বলল, আরও কত ব্যাপারে দেখেছি তোর কত সাহস। শুধু জলেই এত ভয়?

সাহানা বলল, কী করব। ছোটবেলা থেকে কেউ আমার এই ভয় কাটিয়ে দেয়নি।

বিশ্ব চুপ করে বসে আছেন। সাহানা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?

বিশ্ব বললেন, অবশ্যই। এ জন্য অনুমতি নিতে হবে কেন?

সাহানা সিগারেট প্যাকেট বার করতে করতে বলল, আপনি তো আবার গুরুজন হয়ে গেলেন, সেইজন্যই...

বিশ্ব ভুরু কুঁচকে তাকালেন তার দিকে।

সাহানা বলল, ওই যে সায়ন বলল, আপনার সঙ্গে ওর কী একটা আত্মীয়তা বেরিয়ে গেছে। ছেলেটার উৎসাহ আছে বটে, ওর জন্মের আগেও আপনাকে দেখেছে, মানে দেখেনি, গল্প শুনেছে আর ছবি দেখেছে, তাতেই ঠিক বার করে ফেলেছে! আমরা সবাই সায়নের বন্ধু, তাই আমরাও আপনাকে গুরুজন বলে ধরে নিয়েছি।

বিশ্ব বললেন, সে রকম কিছু ভাবার দরকার নেই।

সিগারেট ধরিয়ে সাহানা আবার বলল, আপনি খুব বোর হয়েছেন বুঝতে পারছি। সায়ন আপনাকে খুব করে অনুরোধ করেছে আমাদের গার্জিয়েন হয়ে আসতে, ও নিজে কিংবা জহির সাহেব আসতে পারলেন না।

বিশ্ব শুকনো ভাবে বললেন, না, বোর হব কেন? আজকের দিনটা খুব ভাল।

রিনি বলল, আপনি নিশ্চয়ই এসব জায়গায় অনেকবার এসেছেন। চেনাশুনো কেউ এলেই তাকে একবার সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। আমার কাকা এক সময় দার্জিলিং-এ পোস্টেড ছিলেন। অত সুন্দর জায়গা, কিন্তু ট্রান্সফার নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সারা বছরই তো গেস্ট। আর সব গেস্টকেই একবার করে ভোরবেলা টাইগার হিলে সানরাইজ দেখাতে নিয়ে যেতে হত। সে কি শাস্তি!

বিশ্ব বললেন, আমার সেরকম কোনও আত্মীয়স্বজন নেই, কেউ আসে না।

—আপনি এখানে কত দিন আছেন?

—প্রায় তিন বছর হয়ে গেল।

—এ জায়গাটা এত ভাল লাগে? নাকি থাকতে থাকতে নেশার মতন হয়ে যায়।

সাহানা বললেন, উনি তো আবার একটার পর একটা নেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। এবার কি এ জায়গাটাও ছাড়বেন?

বিশ্ব বললেন, হ্যাঁ, ছাড়বার সময় এসে গেল।

সাহানা বলল, কিছু মনে করবেন না। আমরা লক্ষ করেছি, আপনি এখানে বিশেষ কারুর সঙ্গে মেশেন না। আপনার কোনও বন্ধু নেই। তাহলে তিন বছর এখানে কাটালেন কী করে?

বিশ্ব বললেন, কারুর সঙ্গে মিশি না তা নয়। অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে, কিন্তু বন্ধুত্ব...একটা বয়েসের পরে বোধহয় কারুর সঙ্গেই ঠিক বন্ধুত্ব হয় না।

রিনি বলল, শুধু বেশি বয়েসের কথা কেন, এমন অনেকে আছে, যাদের কোনও বয়েসেই কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। এই তো ইনিই একজন!

সে ইঙ্গিত করল সাহানার দিকে।

সাহানা হালকা গলায় বলল, সে কী রে, আমার বন্ধু নেই? আমার কত বন্ধু!

রিনি বলল, বাজে কথা বলিস না। কারুর সঙ্গেই তোর সম্পর্ক টেকে না। এই তো সায়নের সঙ্গেই এক সময় তোর খুব বন্ধুত্ব ছিল, তা ভেঙে গেল কেন?

সাহানা বলল, তোর জন্য জায়গা ছেড়ে দিলাম।

রিনি হঠাৎ চোখ পাকিয়ে গলা তুলে বলল, তার মানে? তুই কী বলতে চাইছিস? আমি তোর দয়ার পরোয়া করি? সায়ন নিজে এসে আমার কাছে...

সাহানা বলল, আরে আরে, তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি নিজে সায়নকে ছাড়িনি, সায়নই আমায় কাটিয়ে দিয়েছে। চাঁছাছোলা ভাষায় একদিন বলেছে, এই, তুই আমার হাফ-বন্ধু থাকবি, তার বেশি আর এগোবার চেষ্টা করবি না।

রিনি বলল, সায়ন মোটেই ওভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলে না!

সাহানা বিশ্বর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি এসব শুনে কী ভাবছেন?

বিশ্ব বললেন, আপনাদের সঙ্গে তো আমার...

সাহানা বলল, আমাদের আর আপনি-টাপনি বলবেন না। তুমি বলুন।

বিশ্ব বললেন, তোমাদের সঙ্গে তো আমার বয়েসের অনেক তফাত, পুরো একটা জেনারেশন গ্যাপ। তাই এখনকার অনেক কিছুই আমি বুঝি না।

সাহানা বলল, অত বুড়ো বুড়ো ভাব দেখাবেন না। না বোঝার কিছু নেই। এই রিনি এখন সায়নের বান্ধবী, গোয়িং স্টেডি। এক সময় আমিও সায়নের বান্ধবী ছিলাম, চার পাঁচ বছর। তারপর একদিন, আমার দিদি মারা গেল, সায়ন সেদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। দিদি অবশ্য অনেক দিন ভুগছিল, একটা ছেলেও আছে। আমি ছেলেটাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সায়ন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোর দিদি তোকে এত ভালবাসত, তুই একটুও কাঁদলি না? আমি বললাম, না, কাঁদব কেন? জানতামই তো দিদি আর বেশি দিন...। তখন সায়ন বলল, কান্না চেপে রাখা খুব খারাপ। একবার খুব করে কাঁদতে পারলে তবেই স্বাভাবিক হওয়া যায়।

রিনি বলল, বন্ধুরা সবাই বলে, তুই কখনও কাঁদতে পারিস বলে মনেই হয় না।

সাহানা বলল, সত্যি আমি কাঁদতে পারি না রে। জ্ঞান হবার পর থেকে কখনও কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। কাঁদব কেন? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই...আমি কারুর ওপর নির্ভরশীল নই...কেউ আমার জন্য কাঁদবে, তাও আমি চাই না।

রিনি বলল, সায়ন তোকে সত্যিই ওই কথাটা বলেছিল?

সাহানা বলল, আসল পার্টিং কিক কী জানিস? সায়ন সেদিন বলেছিল, যে কখনও কাঁদতে পারে না, সে কারুকে ভালবাসতেও পারে না!

দ্বিতীয় সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে বলল, ভালবাসার সঙ্গে কান্নার কী সম্পর্ক তা আমি আজও বুঝি না। রিনি খুব কাঁদতে পারে, তাই রিনিকে সায়নের এত পছন্দ!

একটু থেমে, হা-হা করে হেসে উঠে সে বলল, এই ছিঁচ-কাঁদুনে মেয়েটা এর পর যখন সারাজীবন যখন-তখন কেঁদে কেঁদে ভাসাবে, তখন সায়ন বুঝবে!

রিনি বলে উঠল, এই, এই।

সাহানা উঠে এসে রিনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই মেয়েটা দারুণ ভাল। এত নরম, এত সুন্দর, ওকে ভাল না বেসে পারা যায়!

সে রিনির গালে গাল দিয়ে আদর করতে লাগল, রিনি ছটফটিয়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে।

সাহানা সরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, দেখুন, সায়নের ব্যাপার নিয়ে রিনির সঙ্গে কিন্তু আমার একটুও মন কষাকষি হয়নি। এখানে আমরা দু'জনে এক ঘরে থাকছি, মাঝেমাঝে আমি ওকে রাগাই একটু আধটু, কিন্তু ঝগড়া হয় না। সায়নের সঙ্গেও আমার সহজ সম্পর্ক, আমরা সবাই মিলে আড্ডা মারি।

বিশ্ব মাথা নেড়ে বললেন, এই ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন।

সাহানা জিজ্ঞেস করল, আপনার নৌকোটায় একদিন আমাকে চড়াবেন? খানিকক্ষণ ঘুরব।

বিশ্ব বললেন, ওটাতে তো একজনেরই ঠিক মতন বসার জায়গা আছে।

সাহানা বলল, এ রকম বানালেন কেন?

বিশ্ব বললেন, আর কারুকে তো সঙ্গে নেবার কথা ভাবিনি!

এই সময় বোটের কাছে ফিরে এল মধুজা।

দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বলল, এই জানিস, প্রবালগুলোর বেশ কয়েকটাকে মনে হয় জীবন্ত। কাছে গেলে নড়ে। হ্যাঁ, সত্যি। ওদিকের একটা বোটের লোকেরা বলল, তারা একটা বড় সাপ দেখেছে।

বলতে বলতে, দু' হাতের ভর দিয়ে বোটে উঠতে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে বোটটা কিছুটা কাত হয়ে গেল এক দিকে। টাল সামলাতে না পেরে ঝুপ করে জলে পড়ে গেল সাহানা।

বিশ্ব মধুজার কথা শুনছিলেন। শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়েই সাহানাকে দেখলেন জলে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ঝাঁপ দিলেন।

এখানে সমুদ্র বেশ গভীর, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে নেমে যাচ্ছে সাহানা। বিশ্ব তার শাড়ির আঁচল ধরে ফেললেন।

অন্য পোশাকের তুলনায় শাড়ির প্রধান অসুবিধে এই যে শাড়িটা ধরলে সেটাই খুলে আসে। আসল মানুষটাকে ধরা যায় না। শাড়িটা উদ্ধারকারীর পায়ে জড়িয়ে যেতে চায়।

সে বাধা পেরিয়ে বিশ্ব ধরে ফেললেন সাহানার একটা হাত। তাতেও খুব সুবিধে হয় না।

যার জলের ভয় খুব বেশি, সে উদ্ধারকারীকে কাছে পেলেই আর সব কিছু ভুলে তাকে খুব জোরে আঁকড়ে ধরে। তাতে উদ্ধারকারীর হাত-পা নাড়তে অসুবিধে হয়।

জলের তলায় বেশ কয়েক মুহূর্ত বিশ্বকে যুদ্ধ করতে হল সাহানার সঙ্গে। এই অবস্থায় বিশ্বর মাথা ঠুকে গেল একটা পাথরে। বেশ জোরে। গলগল করে বেরোতে লাগল রক্ত। সেই অবস্থাতেও তিনি সাহানাকে তুলতে চাইলেন ওপরের দিকে।

এর মধ্যে এসে পড়ল মধুজা। তার সাহায্য নিয়ে সাহানার মাথাটা আগে জলের ওপরে তুলে দিতে আর অসুবিধে হল না।

রিনি অনবরত সাহানা, সাহানা বলে চ্যাঁচাচ্ছে আর কাঁদছে।

॥ ১২ ॥

মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা, নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন বিশ্ব। চক্ষু বোজা।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকল সাহানা। বিশ্বর খাটের পাশে এসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াতেই বিশ্ব চোখ মেললেন। হাসলেন।

সাহানা খানিকটা উদ্বিগ্নভাবে বলল, আপনি হাসপাতাল থেকে চলে এলেন! আমি তো সেখানেই গিয়েছিলাম।

বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বললেন, হাসপাতালে থাকব কেন? আমার তো কিছুই হয়নি।

সাহানা বলল, মাথায় চোট লেগেছে, অনেক রক্ত বেরিয়েছে শুনলাম।

বিশ্ব বললেন, এমন কিছু না। ডাক্তারও তাই বলেছেন। তুমি কেমন আছ?

বিশ্ব নামতে লাগলেন খাট থেকে।

সাহানা বলল, চারটে স্টিচ করতে হয়েছে।

বিশ্ব বললেন, খেলাধুলো করার সময় এরকম কত বার হয়েছে। তোমারই এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল।

—আই অ্যাম ফিলিং কমপ্লিটলি ফ্রেশ।

—তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।

—মাঝেমাঝে এরকম অজ্ঞান হওয়া ভাল। তাতে জ্ঞানচক্ষু ভালভাবে খোলে। আপনার এখানে চায়ের ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি।

—আমি বেশ কয়েকবার চা খাই। এক একদিন নিজের ব্রেকফাস্টও ঘরে বানিয়ে নিই।

—আমি তাহলে একটু চা করি? আমার খেতে ইচ্ছে করছে। আপনি দুধ-চিনি সব খান তো?

—হ্যাঁ, চিনি পাশেই আছে। আমি দুধটা বার করে দিচ্ছি।

একটা কেটলিতে জল ভরে চাপাতে চাপাতে সাহানা বলল, জলে ডুবে যাবার সময় আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কান্না আসেনি।

বিশ্ব বললেন, ভয় পেলে কান্না আসবে কেন? সে তো বাচ্চারা কাঁদে। অ্যাডাল্ট লোকেরা ভয় পেয়ে কাঁদে না।

—তাহলে মানুষ কাঁদে কেন?

—অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। কোনও প্রিয়জনের কষ্ট দেখলে, মৃত্যু দেখলে মানুষ কাঁদে। আবার কারুর ব্যবহারে আঘাত পেলেও চোখে জল আসে।

—অনেকেই যেন ভাবে, কান্নাটা মেয়েদেরই একচেটিয়া। পুরুষরা কাঁদবে না, তাদের কান্নাটা যেন লজ্জার ব্যাপার।

—যে পুরুষরা কাঁদে না, ধরে নিতে হবে, তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই।

—আপনি নিজে কখনও...

—থাক। কান্নার কথা থাক। জলটা ফুটে গেছে বোধহয়।

টি ব্যাগে দু' কাপ চা বানিয়ে দু'জনে বসল কাছাকাছি। একটা চুমুক দেবার পর সাহানা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখে বলল, এই ঘরটায় আপনি কাটিয়ে দিলেন তিন-তিনটে বছর?

বিশ্ব বললেন, খুব লম্বা সময় মনে হয়নি কখনও।

—এর পর কোথায় যাবেন?

হাসিমুখে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বিশ্ব আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক নেই।

সাহানা বলল, আপনার কথা আমার অন্তত সারাজীবন মনে থাকবে। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন।

বিশ্ব উত্তর দেবার আগেই দরজার কাছে অনেক পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কেউ একজন বলল, আসতে পারি?

বিশ্ব বললেন, ইয়েস, কাম ইন।

তার পরই জানলার ধারে একটা ছোট টেবিলের ওপর চওড়া একটা বোর্ড পেপার বিছিয়ে জটার দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কী যেন লিখতে লাগলেন।

ঘরে ঢুকল অমিত, মধুজা, রিনি, সায়ন আর জহির। তাদের সামনে বোর্ডটা উঁচু করে ধরলেন বিশ্ব।

তাতে লেখা : আঘাত যৎসামান্য। মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে চিন্তা করার কিছু নেই। এটা আলোচনার যোগ্যই নয়।

সবাই হাসতে লাগল।

সায়ন বলল, অর্থাৎ কথাবার্তা কমিয়ে দিলেন। গুড টু সি ইউ অন ইয়োর ফিট।

জহির বললেন, বিশ্ববাবুকে তো বেশ কিছু দিন ধরে দেখছি, উনি অসুখ-বিসুখের কথা আলোচনা করা একেবারে পছন্দ করেন না।

বিশ্ব বললেন, অসুখ না হলে আর তা নিয়ে আলোচনা...

সায়ন বলল, একটা কথা জানেন তো, আপনাকে যখন আমি ওদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে আসছিলাম, তখন খুব আপত্তি করেছিল ওই সাহানাই। ও বলছিল, না, না, ওঁকে বিরক্ত করতে হবে না, আমাদের কোনও কেয়ারটেকার লাগবে না। ...এখন দেখলি তো সাহানা! উনি না থাকলে...

সাহানা বলল, এটা নিয়েও বেশি কথা বলা উনি পছন্দ করবেন না। তোরা কেউ চা খাবি? আমি বানিয়ে দিতে পারি।

মধুজা বলল, না, আমরা এখন চা খাব না। আমরা জেলখানায় যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-টা হয়, সেটা দেখতে যাব। বেশি দেরি করা যাবে না।

জহির বললেন, এখন হিন্দি চলছে। ইংরিজি ভার্সানটা সাড়ে ছ'টায়।

অমিত বিশ্বকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যাবেন? আমরা সবাই মিলে গেলে হয়। তারপর আমরা বাইরে কোথাও খাব।

জহির বললেন, ওই শো সবাই একবার দু'বার দেখে, তারপর আর দেখা যায় না।

রিনি বলল, ওঁর পক্ষে সেই টাইগার হিলের ব্যাপার। ওঁকে আজ আমরা একবার সমুদ্রে নিয়ে গেছি। আর এখন জোর করার দরকার নেই।

বিশ্ব বললেন, সমুদ্রে যত বার ইচ্ছে যাওয়া যায়, কখনও পুরনো হয় না, কিন্তু জেলখানাটানা...

অমিত বলল, ঠিক আছে, থাক। তারপর কোনও রেস্তোরাঁয় এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?

বিশ্ব বললেন, আজ আর ইচ্ছে করছে না।

সবাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাহানা বলল, দাঁড়াও, এক মিনিট।

সে ফিরে এসে বিশ্বর বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে, চাদরটা টান করে দিয়ে বিশ্বর মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

॥ ১৩ ॥

সেলুলার জেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল এই দলটি। শো ভেঙেছে, আরও বেরিয়ে আসছে অন্য দর্শকরা।

এরা এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

অমিত বলল, সত্যি, আমরা তো ভুলেই গেছি এঁদের কথা, দেশের স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ নিজেদের জীবন স্যাক্রিফাইস করেছে, বছরের পর বছর এই রকম একটা ভয়ঙ্কর জেলে।

মধুজা বলল, তখন তো এই আন্দামানে আর কিছুই ছিল না।

সাহানা বলল, রিনি, তোর সেই ঠাকুর্দার কথাও রয়েছে দেখলাম। উনি একবার পালাবার চেষ্টা করেছিলেন।

রিনি বলল, তারপর ওঁর ওপর টর্চার বেড়ে যায়। শেষের দিকে পাগল মতন হয়ে গিয়েছিলেন।

অমিত বলল, স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়লেন, তাঁরা নিজেরা কিছুই পেলেন না।

সায়ন বলল, খুব সম্ভবত রোবেস্পিয়ার বলেছিলেন, রেভেলিউশান ডিভাউরস ইটস ওন চিলড্রেন। বিপ্লব তার নিজের ছেলেমেয়েদের খেয়ে নেয়। যারা বিপ্লব করে, তারা অনেকেই সেই বিপ্লবের ফল ভোগ করতে পারে না।

অমিত বলল, ফরাসি বিপ্লবের পর, দ্যাখ না, অত বড় বিপ্লবে ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের অবসান হল, কিন্তু আসল বিপ্লবীরা কেউ তার সুফল ভোগ করতে পারল না। মাঝখান থেকে নেপোলিয়ান এসে সম্রাট হয়ে বসল।

মধুজা বলল, ওই জন্যই কি বাংলায় একটা কথা আছে, নেপোয় মারে দই?

সবাই হেসে উঠল।

সায়ন বলল, আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পর কিছু কিছু নেপো শুধু দই নয়, রাবড়ি খাচ্ছে, আর বহু লোক কিছু খেতেই পায় না।

অমিত বলল, ঠিক আছে, তাদের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। নাউ আই অ্যাম স্টারভিং। খিদেয় পেট জ্বলছে। কোথায় যাওয়া যায় বল তো?

রিনি বলল, নিউ লাইট হাউস রেস্টুরেন্টে যাবি?

মধুজা বলল, আন্দামান নিউ রিসর্টেও যাওয়া যেতে পারে।

অমিত বলল, ওটা এখান থেকে বড্ড দূরে। লাইট হাউসটা কাছে, এই তো একটুখানি।

সায়ন বলল, আমি একটা কথা বলি? বাইরের কয়েক জায়গায় তো খেয়ে দেখলাম। আমার হোটেলের খাবারটাই কিন্তু বেস্ট। আমি সাজেস্ট করছি, আমার হোটেলেই চল।

রিনি বলল, সেটাই ভাল।

অমিত বলল, তাহলে যে আমার খাওয়ানো হবে না।

সায়ন বলল, ধুৎ! সেটা আবার একটা ব্যাপার নাকি? তুই কলকাতায় খাওয়াবি।

সবাই চলে এল সায়নের হোটেলের ঘরে।

অমিত প্রথমেই বলল, আমি একটা ড্রিঙ্ক নিচ্ছি। তোমরা কে কী নেবে বলো।

সায়ন টেলিফোন তুলে বলল, আর কিছু স্ন্যাকস বলে দিচ্ছি। পরে ডিনারের অর্ডার দেব।

মধুজা একটা গেলাসে কিছুটা ওয়াইন ঢেলে নিয়ে বলল, আমার মনে হয়, বিশ্ববাবুকে আমাদের কিছু একটা উপহার দেওয়া উচিত। উনি আজ সাহানাকে বাঁচাবার জন্য মাথা ফাটালেন।

সাহানা বলল, ওঁকে কিছু দিতে গেলেও উনি নেবেন না।

মধুজা বলল, তুই কী করে বুঝলি? তুই কি কিছু দিতে চেয়েছিলি?

সাহানা বলল, নাঃ! এক একজনের স্বভাব দেখলেই তো বোঝা যায়। উনি নিজের সব জিনিস বিলিয়ে দিচ্ছেন, কালকেও আমাদের লজের কুক আর রতন নামে ছেলেটিকে ওঁর শার্ট-প্যান্ট দিয়ে দিয়েছেন, আরও কয়েকজনের কাছে শুনলাম।

রিনি বলল, উনি নিন বা না নিন, আমাদের দিক থেকে অন্তত একটা গেশ্চার...অবশ্য এক্ষুনি এক্ষুনি দিতে গেলে মনে হবে, আমরা শোধ-বোধ করতে চাইছি। পরে না হয় দেখা যাবে।

অমিত বলল, আর সময় কোথায়? কাল টিকিট পাইনি, পরশুর ফ্লাইটে আমাদের ফিরতেই হবে।

সাহানা বলল, সবাইকে সব কিছু শোধ করা যায় না।

সায়ন সিডি প্লেয়ারে একটা বিলিতি বাজনার সিডি চাপিয়ে দিল। বেশ লাউড মিউজিক। এরকম বাজনা শুনলেই নাচতে ইচ্ছে করে।

হাতে সুরার পাত্র নিয়েই অমিত মধুজার হাত ধরে টেনে তুলে নাচতে

শুরু করে দিল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সায়ন সাহানাকে বলল, আয়, আমরাও নাচি।

সাহানা বলল, তুই আগে রিনির সঙ্গে...আমি আজ বেশি করে মদ খাব।

সে দু'হাতে তাল দিতে লাগল ওদের নাচের সঙ্গে। ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল সেই নাচ।

এখন আর স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে কিংবা স্বাধীনতার পরেও যাদের দু'বেলা অন্ন জোটে না, তাদের কথা এদের মনে রইল না।

না থাকাটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ মানুষই তো নিজস্ব পরিমণ্ডল আর কাছাকাছি বর্তমান নিয়ে বাঁচে।

॥ ১৪ ॥

সদ্য ভোর হয়েছে, নিজের তৈরি নৌকোটায় উঠে কী সব কাজ করছেন বিশ্ব।

একটা কুকার, একটা ছোট তোলা উনুন, দু'একটা সসপ্যান আর গোলাপ ভরছেন নৌকোটার খোলের একটা ড্রয়ারে।

খানিক বাদে একটা গাড়ি এসে থামল, তার থেকে নেমে হন হন করে হেঁটে এল সায়ন। তার চোখ লালচে, চুল উস্কোখুস্কো।

বিশ্ব কাজ থামিয়ে তাকালেন তার দিকে।

সায়ন বলল, আপনাদের লজে গিয়েছিলাম। পেছন দিকের বসবার জায়গাটাও দেখলাম। তারপর মনে হল, আপনি এখানে আসতেও পারেন।

বিশ্ব জিজ্ঞেস করলেন, এত সকালে, কী ব্যাপার? কারুর কিছু হয়েছে?

সায়ন বলল, না। আপনিই বা এত সকালে কী করছেন এখানে? আজই কোথাও যাবেন নাকি?

বিশ্ব বললেন, না, হয়তো আজই হবে না। আরও দু'একদিন... কয়েকটা জিনিস রেখে দিচ্ছি...। হঠাৎ তুমি আমার কাছে ছুটে এলে।

নৌকোটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সায়ন বলল, কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি।

—কেন?

—শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। কেন, সেটা ব্যাখ্যা করা খুব মুশকিল। আমার বন্ধুরা বলছে, আপনাকে আমি আগে কখনও দেখিনি, আপনি আমার জন্মেরও আগে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন, সেও তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে। ফ্যামিলি অ্যালবামে আপনার দু'একটা ছবি দেখেছি, আর আপনার সম্পর্কে কিছু গল্প শুনেছি, তাও তো অনেক বছর আগে। তবু, আপনাকে দেখা মাত্র আমার চেনা চেনা লাগল, এটা অস্বাভাবিক নয়?

—অস্বাভাবিক কী করে বলব? ছেলেবেলায় শোনা গল্প অনেকগুলোই মনে থাকে না, আবার দু'একটা মনে থেকেও যায়। হয়তো তোমার পিসি এমন ভাবে আমার কথা বলেছেন, যা তোমার মনে গেঁথে গেছে। এটা খুব স্বাভাবিক না হলে অস্বাভাবিকও নয়।

—আপনি আমার পিসিকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন?

—কখনও কখনও শুনিয়েছি বোধহয়। সেই বয়েসে আমি খুব কবিতা আবৃত্তি করতাম।

সায়ন একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে বলল, আপনি নেবেন?

বিশ্ব বললেন, না। ছেড়ে দিয়েছি।

সায়ন বলল, সে তো মাত্র কয়েক দিন আগে। এখন অন্য কারুর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পেলে মনটা আনচান করে না?

—নাঃ, মন থেকেই মুছে ফেলেছি।

—কত বছর বয়েস থেকে সিগারেট ধরেছিলেন।

—কলেজ জীবনে, আঠারো-উনিশ হবে।

—আমাদের বাড়িতে যখন যেতেন, তখন তাহলে খেতেন নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, তখন আমি চেন স্মোকার প্রায়। তখন তো আর স্মোকিং নিয়ে এত সব কথাবার্তা হত না। আমি জাহাজের কাজ করতাম বলে খুব ভাল বিদেশি প্যাকেট পেতাম। তোমার বাবা ছিলেন নন স্মোকার, তবে তোমার কাকা মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিত।

—কাল সারা রাত না ঘুমিয়ে আমার মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, আপনি রাগ করুন আর যাই-ই করুন, আমাকে সেই প্রশ্নগুলো করতেই হবে। আশা করি আপনি সঠিক উত্তর দেবেন।

বিশ্ব সায়নের পিঠে একটা হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি এত উত্তেজিত হয়ে আছ কেন, সায়ন? তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আমার তো কখনও ঝগড়াঝাটি হয়নি। কারুর কোনও ক্ষতিও করিনি। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব না কেন?

সায়ন সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুড়ে ফেলে বলল, দেখুন, আমার বত্রিশ বছর, মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছি। নিজের কেরিয়ার আমি নিজেই তৈরি করেছি, জীবন সম্পর্কে আমার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে। বংশমর্যাদা, রক্তের টান, এসবই অনেকটা বানানো ব্যাপার, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি জানতে চাই, আপনি এক সময় আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতেন, হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলেন কেন? আমার বাবা আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

—নাঃ, রমেনদা আমাকে কিছুই বলেননি।

—বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

—রমেনদা আমাকে পছন্দই করতেন। আগে তো তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ যাতায়াত ছিল না। চন্দননগরে আমি একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানেই রমেনদা-বউদির সঙ্গে দেখা। আত্মীয়তাটা ঝালিয়ে নেওয়া হয়। রমেনদাই আমাকে বলেছিলেন, তুই মাঝে মাঝে আসবি। তার কিছু দিন আগেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন, সেই জন্যই।

—বাবার সঙ্গে আপনার গল্পসল্প হত?

—রমেনদা নিজের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। খুব একটা গল্পসল্প করার সময় পেতেন না। খানিকটা কনজারভেটিভ ধরনের মানুষ ছিলেন। তোমার কাকা থিয়েটার করত, সেটা পছন্দ করতেন না রমেনদা।

—আমার মণিপিসি, তার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক হয়েছিল?

—মণিমালা। তার তো তখন তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস, ওই বয়েসে যা হয়, আমাকে খুব হিরো ওয়ারশিপ করত, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাইত। তার সঙ্গে আর কী সম্পর্ক হবে?

—তা হলে আপনি আমাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করলেন কেন?

—আমি আর যেতাম না, কারণ, তোমার মা আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

—মা বারণ করেছিলেন, কেন?

—অনেকটা আমারই দোষ ছিল। বরাবরই আমার কাণ্ডজ্ঞান কম। আমি ঘন ঘন যেতে শুরু করেছিলাম। এক একদিন ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। তাই সুধাবউদি একদিন বললেন, বিশ্ব, তুমি এত ঘন ঘন চলে আসো, লোকে কী ভাববে বলো তো? তোমার নিজেরও তো কাজকর্ম নষ্ট হচ্ছে। তুমি আর এসো না এমন ভাবে।

—মা এ কথা সত্যি বলেছিলেন? মা এরকম ভাবে সরাসরি কারুকে বারণ করতে পারেন?

—আমাকে বকুনি দেবার অধিকার তোমার মায়ের ছিল।

—তারপর আপনি আর একদিনও যাননি?

—না।

—অন্য কোথায়, কলকাতায়, আমার মা কিংবা বাড়ির আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

—না। তখন আমাদের পারিবারিক ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। জাহাজ কেনার ক্ষমতা তো ছিল না, প্রচুর ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে একটা ছোটখাটো জাহাজ লিজ নিয়েছিলাম। সেই সময় বেঙ্গলে খুব পলিটিক্যাল গণ্ডগোল শুরু হয়, নকশালরা মাথাচাড়া দিচ্ছে, আমার প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। আমি তখন একটা জাহাজ কোম্পানিরই চাকরি নিয়ে চলে গেলাম সিঙ্গাপুর। সেখানেই অনেক বছর...

এই সময় ভেলু ছুটতে ছুটতে চলে এলো সেখানে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবু, বাবু, তোমারে ম্যানেজারবাবু খুঁজছেন।

কানটা ঝুঁকিয়ে বিশ্ব বললেন, কী বললি, আবার বল।

ভেলু বলল, ম্যানেজারবাবু খুঁজতেছেন।

বিশ্ব হেসে বললেন, সায়ন, লক্ষ করলে? ওর ল-এর অসুখটা কেটে

গেছে।

সায়নের মুখখানা থমথমে। সে এ কথায় মন দিল না।

বিশ্ব ভেলুকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ম্যানেজারবাবু আমাকে এই সাতসকালে খুঁজছেন কেন?

ভেলু বলল, তা আমি জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, জানি। আমাগো রতন, সে একটা সোনার ঘড়ি কুড়ায়ে পেয়েছে। জালাজালি হয়ে গেছে। না, জানাজানি, জানাজানি। ম্যানেজারবাবু ভেবেছেন, রতন ওইডা চুরি করছে। রতন খুব কানতেছে। ম্যানেজারবাবু ভাবলেন বুঝি, ঘড়িটা...আমি কিছু কই নাই।

বিশ্ব বললেন, তোকে কিছু বলতেও হবে না। চুপ করে থাকবি। ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে শুধু বলবি, আমি এখন ব্যস্ত আছি। পরে যাব।

সায়ন জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আকাশ। আজ আবার মেঘ ঘনাচ্ছে আকাশে। সমুদ্রের দূরের দিকটা ঝাপসা।

ভেলু চলে যেতেই সায়ন আবার বিশ্বর কাছে ফিরে এসে বলল, এবারে আমার শেষ প্রশ্ন। আমি চাই, আপনি একেবারে সত্যি উত্তরটা দেবেন। আপনি আমাদের বাড়িতে আসা যখন বন্ধ করেন, তখন আমার মা কনসিভ করেছেন। মায়ের পেটে আমার বয়েস পাঁচ-ছ মাস। আমি সময়টা ভাল করে চেক করেছি। আপনিই কি আমার সত্যিকারের বাবা?

বোমা ফাটার মতন বিরাট চিৎকার করে বিশ্ব বললেন, নো! না, না।

প্রায় একই রকমভাবে গলা তুলে সায়ন বলল, সত্যি কথা বলুন, সত্যি কথা বলুন।

মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলেন বিশ্ব।

তারপর আবার মুখ তুলে ধীর স্বরে বললেন, তোমার প্রশ্নের সত্যি উত্তর হচ্ছে, না আর হ্যাঁ, দুটোই।

সায়ন আবার ধমক দিয়ে বলল, আবার আপনি হেঁয়ালি করছেন? স্পষ্ট করে বলুন, ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো?

বিশ্ব বললেন, হেঁয়ালি করিনি, সায়ন। আমি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করি না, কার নামে শপথ নেব বলো? এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে আমি তোমার মাকে সেভাবে কোনও দিন স্পর্শ করিনি। সুধা বউদির সঙ্গে আমার কখনও শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, যদিও সে রকম সুযোগ ছিল, কিন্তু আমরা...না। হয়নি। আবার এ কথাও সত্যি, আমি সুধা বউদিকে খুবই ভালবাসতাম। আমি তোমার বায়োলজিক্যাল ফাদার নই, কিন্তু তুমি আমাদের ভালবাসার সন্তান।

জুতো দিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে সায়ন বলল, আপনি আমার মাকে ভালবাসতেন, সে কথা জানিয়েছিলেন আমার মাকে?

বিশ্ব বললেন, তোমার মা যেদিন আমাকে নিষেধ করলেন আর ও বাড়িতে যেতে, সেদিন তিনি আরও কয়েকটা কথা বলেছিলেন, তার সবটা তোমাকে বলিনি। এখন মনে হচ্ছে, বলা দরকার। তার প্রতিটি শব্দ আমার মনে আছে।

—নিশ্চয়ই। বলুন। আমি সবটা জানতে চাই।

—সুধাবউদি বলেছিলেন, বিশ্ব, আমি যখন আমার স্বামীর পাশে শুয়ে থাকি, উনি শুধু কাজের কথা বলেন, সে সব আমার ভাল লাগে না। আমি গান চালিয়ে দিলেও উনি বন্ধ করে দ্যান। তখন আমার তোমার কথা মনে পড়ে। তোমার মুখ। এটা খুবই লজ্জার কথা। আমার অপরাধবোধ হয়, কিন্তু কী করব? তাই আমি বলছি, তুমি আর এসো না, আমি তোমাকে ভুলে যেতে চাই।

—আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের কখনও মনের মিল হয়নি। দু'জনের রুচি দু'রকম ছিল। শুনেছি, কখনও ঝগড়া হত না। কিন্তু দূরত্ব ছিল অনেকখানি।

—ঝগড়া মানে? সুধাবউদিকে আমি কখনও উঁচু গলায় কথা বলতে দেখিইনি।

—আমার যখন দু'-আড়াই বছর বয়েস, তখনই মা-বাবার সেপারেশান হয়ে যায়। মা আমাকে নিয়ে চলে আসেন মুম্বইতে। আমার মায়ের বাবা বাঙালি, কিন্তু মা একজন মরাঠি মহিলা। এটা আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ, জানতাম।

—প্রথম এক বছর আমরা ছিলাম সেই মরাঠি-দিদার কাছে। তারপর মা একটা স্কুলের চাকরি জোগাড় করে আমাকে নিয়ে একাই থাকতেন। মা আর একবারও চন্দননগর কেন, বাংলাদেশেই যাননি। দু'বছর পর মিউচুয়াল ডিভোর্স হয়ে যায়। বাবা আবার বিয়ে করেন, পরে দু'টি সন্তানও হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন, আমার মা যখন চন্দননগর ছেড়ে চলে এলেন, ডিভোর্সের কোনও অসুবিধেই ছিল না, তখন আপনারা বিয়ে করলেন না কেন? দ্যাট ওয়াজ দা মোস্ট নর্মাল থিং টু ডু। নাকি আপনি বোকার মতন ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে হা-হুতাশ করতে লাগলেন?

বিশ্ব একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, বোকার মতন কাজই করেছি বটে।

সায়ন বলল, স্যরি, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বিশ্ব বললেন, না, ঠিকই তো। সুধাবউদি বলেছিলেন, তিনি আমাকে ভুলে যেতে চান। আমি ধরে নিলাম আমাকেও তাই করতে হবে। তাই সিঙ্গাপুর গিয়ে ছ'মাসের মধ্যে আমি একজন পাঞ্জাবি মহিলাকে বিয়ে করে ফেললাম। দ্যাট ওয়াজ দা মোস্ট স্টুপিড থিং টু ডু। আমরা পরস্পরের মন ভাল করে না বুঝেই...তিনি এমনিতে বেশ ডিসেন্ট মহিলা ছিলেন, খুব এফিসিয়েন্ট, খুব প্র্যাক্টিক্যাল, আমারই দোষ, আমার সঙ্গে তাঁর মনের মিল হল না। সায়ন, তোমার কাছে স্বীকার করছি, রাত্তিরে, সেই মহিলার পাশে শুয়েও আমি সুধাবউদির কথাই ভাবতাম, তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম। ভুলে যাবার বদলে যেন আরও তীব্রভাবে...যদিও আমাদের মিলন হয়নি। তবু আমরা পরস্পরকে চেয়েছিলাম...সেই জন্যই বলেছি তুমি আমাদের ভালবাসার সন্তান। এই ভালবাসা...একালের ছেলে-মেয়েরা বোধহয় মানবে না, ঠাট্টা করবে। হয়তো বলবে রোমান্টিকতার বুজরুকি, কিংবা ন্যাকামি।

সায়ন বলল, ভালবাসার আবার একাল-সেকাল আছে নাকি? হয়তো ওপর ওপর কিছুটা বদলায়...সেক্স নিয়ে অতটা ইনহিবিশান নেই।

—সায়ন, তোমার সঙ্গে আমার কোনও দিন দেখা হয়ে যাবে, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

—মুম্বই শহর অনেকটা ওয়েস্টার্নাইজড। ওখানে ডিভোর্সের পর আবার একটা বিয়ে করা অনেক দিন ধরেই চলছে। মা আর বিয়ে তো করলেনই না, তাঁর কোনও বিশেষ পুরুষ বন্ধুও দেখিনি। গান-বাজনা শুনতে ভালবাসেন। তাই নিয়েই সময় কাটান। তবে এক একসময় যখন চুপ করে বসে থাকেন, তখন তাঁর চোখে আমি যেন কোনও একজন পুরুষের ছায়া দেখতে পাই, হ্যাঁ, এখনও পাই। যদিও মা আমাকে কোনও দিন কিছুই বলেননি। পরে আপনি আমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করেননি। চিঠিও লেখেননি?

—আমি বিয়ে করে ফেলার পর আর কোন মুখে যোগাযোগ করি বলো? চিঠি লেখা দূরের কথা, মুম্বই শহরেই আমি কখনও যাইনি ইচ্ছে করেই।

—এইভাবে আপনারা দু'জনে দু'জনের জীবন নষ্ট করলেন?

—না, না, নষ্ট কেন হবে? সুধাবউদি তোমাকে পেয়েছেন। সন্তানের মধ্য দিয়েও তো মানুষ অনেক কিছু পায়।

—আর আপনি? আপনি কী পেলেন?

—আমিও কিছু পাইনি তা বলব না। সেরকম কোনও আফশোস আমার নেই। জীবন আমাকে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে, আমার নাকে দড়ি দিয়ে অর্ধেকটা পৃথিবী ঘুরিয়েছে। তবে, মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনও ব্যাকুলতা নেই। নিজের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করে নিয়েছি।

—আপনি আমার সঙ্গে মুম্বই চলুন না।

—অ্যাঁ? না, না, না, এখন আর সেখানে গিয়ে কী করব?

—দেখুন না, অল্প বয়েসের প্রেমিকার সঙ্গে কত দিন পর দেখা হলে কেমন লাগে? মায়ের রি-অ্যাকশানটাও দেখব।

—তা আর হয় না। সুধাবউদি আমাকে দূরে সরে যেতে বলেছিলেন।

—সে তো কত কাল আগেকার কথা। বত্রিশ বছর! ও কথার এখন কোনও গুরুত্ব আছে? চলুন।

দু'দিকে মাথা দুলিয়ে বিশ্ব খুব আস্তে আস্তে বললেন, না সায়ন। আমি আমার জীবনের শেষ দেখে নিয়েছি। আর কারুর কাছে যাব না। পুরোনো কালের ছবিটাই চোখে নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে।

তিনি নৌকোটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

॥ ১৫ ॥

কয়েক দিন আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল। আজ একটু বেলা হতেই শুরু হল ঝড়। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলসানি আর বজ্রগর্জন।

এই সময় সাধারণত কেউ বাড়ি কিংবা হোটেলের বাইরে বেরোয় না। কিছু দিন আগেই এক ছেলের মাথায় বাজ পড়েছিল, সে বাঁচেনি।

তাছাড়া সুনামির তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও দগদগ করছে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে। অনেকের ধারণা, ঝড়ের সঙ্গে বুঝি সুনামির সম্পর্ক আছে। সুনামি আবার শিগগিরই হবে, এমন একটা কথাও প্রায়ই শোনা যায়।

ঝড়ের পর বৃষ্টি। মনে হয় যেন সমুদ্রটাই আকাশে চলে গেছে, আবার সেখান থেকে নেমে আসছে সহস্র ধারায়।

তবে বাংলাদেশের বর্ষার মতন এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। হঠাৎই থেমে যায়। তারপর ওপরের দিকে তাকালে বিশ্বাসই হয় না যে আকাশ কখনও মেঘলা ছিল। একেবারে নীল। আকাশের প্রতিফলনেই সমুদ্রের রং নীল। কিন্তু জলের নীল বেশি গাঢ়, মনে হয় কলম ডোবালে লেখা যাবে। একেবারে ধারের জল অবশ্য পাতলা নীল, তাতে যেন খানিকটা সবুজেরও আভা। এই আভা কোথা থেকে আসে, কে জানে।

রোদ ঝলমল বিকেলে আবার সবাই বেরিয়ে পড়েছে পথে পথে। সমুদ্রের ধারে।

একটা নিরিবিলি জায়গায় জমায়েত হয়েছে কয়েকজন নারী-পুরুষ। পাতা হয়েছে কয়েকটি চেয়ার। একটা চেয়ারে রাখা আছে দু'টি ফুলের তোড়া। আর একটা ছোট টেবিলে একটি সুদৃশ্য, সোনালি মলাট দেওয়া খাতা।

সবসুদ্ধ দশ-বারোজন। সাহানা আর অমিত বসাচ্ছে সবাইকে।

জহির ইকবাল এসে বললেন, ব্যাপার কী, জরুরি তলব?

অমিত বলল, বসুন না। একটা বেশ মজা হবে।

মধুজা সঙ্গে করে নিয়ে এল বিশ্বকে। তার মুখেও বিস্ময়ের ভাব।

গাড়ি থেকে নামল সায়ন আর রিনি। ছুটতে ছুটতে এল ভেলু। গীতাঞ্জলি লজের ম্যানেজারও উপস্থিত। অনেকেই কথা বলতে শুরু করেছে নিজেদের মধ্যে।

একটু পরেই অমিত সামনে গিয়ে এদিক ফিরে হাততালি দিয়ে বলল, সাইলেন্স প্লিজ। সাইলেন্স প্লিজ। পে অ্যাটেনশান!

তারপর বলল, গুড আফটার নুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন।

না, বাংলায় বলছি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আপনাদের প্রায় জোর করেই ডেকে এনেছি, সময় বেশি নেই, তাই তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে, আপনাদের ডেকেছি একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অনুষ্ঠানটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং আনন্দের। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের দুই বন্ধু এই যে, সায়ন আর রিনি, এই তোরা দু'জন এখানে চলে আয়, আমার পাশে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এই দুই বন্ধুর আজ বিয়ে, বিয়ে...

সে মধুজার দিকে তাকাতেই মধুজা বলে দিল, শুভ পরিণয়।

অমিত বলল, হ্যাঁ, শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে। বিয়ে করতে গেলে যে মন্ত্র পড়তেই হবে সেরকম কোনও হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, আই মিন, নিয়মের কড়াকড়ি নেই। কবিতা পড়ে, গান গেয়েও হতে পারে। স্যান্সকৃট মন্ত্রগুলিও তো আসলে গান, তাই না? আমরা বিয়ের সময় ওই সব সংস্কৃত মন্ত্র পড়েছি। কিছুই মানে বুঝিনি। আপনারা কেউ কেউ হয়তো মানতে পারেন, আমাদের জেনারেশানে আমরা তো স্যাংসকৃত শিখি না, তাই বাংলা গানই তো ভাল। আসল ব্যাপার হচ্ছে রেজিস্ট্রি করা, সেটা কলকাতায় ফিরে করিয়ে নিলেই হবে, আপনারা এই বিয়েতে সাক্ষী দেবেন। ওইখানে একটা খাতা রাখা আছে, আপনারা অনুগ্রহ করে যদি সই করেন।

সাহানা বলল, আমি আগে সই করব।

সায়ন আজ ধুতি আর পাঞ্জাবি পরেছে, রিনির পরনে একটা জমকালো শাড়ি।

সাহানা সায়নকে জিজ্ঞেস করল, এই, তুই ধুতি-পাঞ্জাবি সঙ্গে করে এনেছিলি নাকি?

সায়ন বলল, একটা পাঞ্জাবি তো থাকেই। আর পা-জামা। অমিতটা ইনসিস্ট করল। ধুতি পরতেই হবে। তাই আমার হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে ধার করতে হল।

সাহানার পেছনেই এসেছেন জহির, সই করবার জন্য।

তিনি রিনিকে বললেন, আপনিও কি বেনারসি শাড়িটা আগে থেকেই ভেবে-চিন্তে নিয়ে এসেছেন?

রিনি বলল, এটা বেনারসি কে বলল? মোটেই না, এটা টাঙ্গাইল।

অমিত বলল, এই, এই, এখনও ফাংশান শেষ হয়নি। সাহানা, তুই খাতাটা সবার কাছে নিয়ে যা। আপনারা বসুন। মন্ত্র না পড়া হলেও একজন পুরোহিত তো লাগবে? আমি রিকোয়েস্ট করছি, মিস্টার বিশ্বরঞ্জন রায় যদি এখানে আসেন, পুরো, পুরো, আই মিন, পৌরোহিত্য করার জন্য।

বিশ্ব দুই ভুরু তুলে বললেন, আমি? আমি কী করব?

মধুজা তাঁর হাত ধরে বলল, আসুন।

বিশ্ব অসহায় ভাবে বললেন, আমি তো কিছুই জানি না।

অমিত বলল, আপনাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। আপনি ওদের দু'জনের হাতে-হাত মিলিয়ে দিন। তারপর যদি দু'চার কথা বলতে ইচ্ছে হয় বলবেন, না হয় বলবেন না। তারপর এই ফুলের তোড়া দু'টো তুলে দেবেন ওদের হাতে। ব্যাস, এইটুকুই।

রিনি আর সায়ন এসে দাঁড়াল বিশ্বর দু'পাশে।

বিশ্ব দু'জনের এক হাতের ওপর আর এক হাত মিলিয়ে দিলেন। তারপর খুব নিচু গলায় বললেন, আমি আর কী বলব? তোমরা সারাজীবন ভালবাসায় বিশ্বাস রেখো।

ফুলের তোড়া দু'টি দু'জনের হাতে তুলে দেবার পর, ওরা দু'জনেই নিচু হয়ে বিশ্বর পায়ের পাতা ছুঁতে গেল, তার আগেই তিনি ওদের জড়িয়ে ধরলেন।

আন্দামানের অনেকেই যাঁকে একজন রস-কষহীন মানুষ মনে করে, তাঁরও চোখে এখন জল এসে যাচ্ছে। সেটা গোপন করার জন্য তিনি অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

অমিত এর মধ্যে একটা কবিতার বই-ও জোগাড় করে ফেলেন। 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তার একটা পাতা খুলে অমিত বিশ্বকে বলল, মন্ত্রের বদলে আপনি শুধু এই কয়েকটা লাইন পড়ে দিন প্লিজ। তারপর সাহানা একটা গান গাইবে।

বিশ্ব সেই কবিতাটাই পড়লেন না। নিজেকে কিছুটা সামলে নেবার জন্য সময় নিতে তিনি পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

তারপর পড়তে শুরু করলেন,

মনে রে আজ কত যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
  সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
  সিকি পয়সাও ধারে না যে,
কতকটা সে স্বভাব তাদের
  কতকটা বা তোমারো ভাই
কতকটা এ ভাবের গতিক
  সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
  তুমিও কতক দেবে ফাঁকি
তোমার ভোগে কতক পড়বে
  পরের ভোগে পড়বে বাকি।
মান্ধাতারই আমল থেকে
  চলে আসছে এমনি রকম
তোমারি কি এমন ভাগ্য
  বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মন রে আজ কই যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
  সত্যেরে লও সহজে...

এই দৃশ্য থেকে অনেক দূরে, কারবাইন কোভের বেলাভূমিরও এক পাশে গাছপালার আড়ালে বিশ্বর নিজের হাতে গড়া নৌকোটি দুলছে।

আজ ঝড়ের সময় কোনও রকমে খুলে গেছে তার দড়ির বাঁধন। ঢেউয়ের ধাক্কায় একবার সেটা সরে আসছে পাড়ের দিকে, আবার সরে যাচ্ছে একটু দূরে।

ক্রমশ সেটা দূরেই যেতে লাগল, আর ফিরল না।

আকাশে এখন অস্ত সূর্যের লাল আভা।

শিল্পী: সমীর সরকার